লাভ ইন সিঙ্গাপুর – হেইট ইন সিঙ্গাপুর

– মোহাম্মদ আবুল হায়দার শিপার

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুরে স্কলারশিপ নিয়ে সিঙ্গাপুর আসা। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সিঙ্গাপুর আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর লাগতে শুরু করেছে। এই প্রথম অনুভব করলাম, মানুষের তৈরি যে কোনো জিনিস, হোক না তা যতোই সুন্দর, এক সময় তা বিরক্তির উদ্রেক করে। কিন্তু এ রকম কখনোই হয়নি আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। সারাটা জীবন যেখানে কাটিয়েছি সেই মাঠ–ঘাট, মেঠোপথ–প্রান্তর এক মুহূর্তের জন্যও বিরক্তির উদ্রেক করেনি আমার। সম্ভবত প্রকৃতি নির্মিত বিষয়বস্তুর কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। সিঙ্গাপুর–এর জৌলুস যা দিতে পারেনি সেই সন্তুষ্টি আর বেচে থাকার আনন্দ আমাকে দিয়েছে আমার দেশ মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

সিঙ্গাপুরে প্রথম এসে যে জিনিসটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছিল সেটা হচ্ছে এখানকার নিয়ম–শৃঙ্খলা। কিন্তু এক সময় মনে হলো, সবই বড় কৃত্রিম, বড়ই প্রাণহীন। জীবন এখানে চলে মেশিনের গতিতে। এখানে জীবন মানে ছিন্ন করা হৃদয়ের বন্ধন, ভুলে যাওয়া আত্মার আত্মীয়তা, হারিয়ে ফেলা প্রাণ–চাঞ্চল্য। কিন্তু আমরা তো মেশিন নই, আমরা মানুষ।

এখানে প্রথম এসে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম তা হচ্ছে খাবার। আসলে সিঙ্গাপুরিয়ান বলতে বোঝা হয়, চায়নিজ ৯০%, ইনডিয়ান অরিজিন ৫% এবং মালয়শিয়ান ও অন্যান্য হচ্ছে ৫%। চায়নিজরা দিনে আট দশবার খায়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এদের খাওয়া চলতে থাকে। পৃথিবীর এমন কোনো জিনিসই নেই যা এরা খায় না। সাপ, ব্যাঙ, কাকড়া ইত্যাদি সবই আছে এদের খাদ্য তালিকায়। তবে সাধারণত এদের প্রধান খাবার হলো নুডলস।

এখানকার লোকদেরও জীবনযাত্রা ইওরোপিয়ান স্টাইলের। বাসায় রান্না করে না। খাওয়া–দাওয়া সত্ত্বেও বাইরের খাবারের দোকানে বা রেস্টুরেন্টে যায়, যেগুলোর সংখ্যা অগুনতি। ফলে পারিবারিক বন্ধন খুবই দুর্বল। বিয়ে–বিচ্ছেদের হার বেশি। অফিশিয়াল ভাষা ইংরেজি হলেও বেশির ভাগ সময় কথাবার্তা চলে চায়নিজ বা ম্যান্ডারিন অর্থাৎ এক ধরনের আঞ্চলিক চায়নিজ ভাষায়। দুই চায়নিজ এক হলে তো আর কোনো কথাই নেই। কিচিরমিচিরের ঠেলায় উড়াল দিতে ইচ্ছা করে।

পক্ষান্তরে ইনডিয়ানদের অধিকাংশই হলো তামিল, কিছু কেরালা এবং অন্ধ্র প্রদেশের লোকও আছে। এক প্রদেশের লোক আরেক প্রদেশের লোকদের দুই চোখে দেখতে পারে না, এমনকি পারতপক্ষে কথাই বলে না। ইনডিয়ানদের অধিকাংশই হচ্ছে ভেজিটেরিয়ান। রুটি, বিস্কিট জাতীয় খাবারই বেশি খায়। সব সময় থাকে পয়সা বাচানোর ধান্দায়।

আমাদের বেচে থাকার একমাত্র সম্বল হলো মালয়শিয়ান মুসলিম ফুডস। এই মালয়শিয়ানরা সব কিছুতেই চিনি বা সস জাতীয় মিষ্টি পদার্থ ব্যবহার করে। অর্থাৎ এরা হচ্ছে মিষ্টি প্রিয় জাতি। প্রথম প্রথম এসব খাবার খেতে গেলে বমি আসতো। বর্তমানে অভ্যাস হয়ে গেছে। ক্ষিধে কাতর হলে বাঘেও ঘাস খায়। আর আমি তো মানুষ! নিজের রান্না খেতে ভালো না লাগলে এখন চিনি বা মিষ্টি সস ঢেলে গপ গপ করে খেয়ে ফেলি। অসুবিধা হয় না।

এবার আসছি দ্বিতীয় এবং প্রধান সমস্যার কথায়। সেটা হচ্ছে বর্ণ বৈষম্য। শাদা চামড়ার চায়নিজ বা সিঙ্গাপুরিয়ান চায়নিজরা কালো চামড়ার লোকদের খুবই অবহেলা করে। অবশ্য হাতের পাচ আঙুল সমান নয়, কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। আমার ফ্ল্যাটমেট নাইজেরিয়ান লোকমান এবং অন্যান্য কালো চামড়ার ছাত্রছাত্রীরা এই বর্ণ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শাদা চামড়ার প্রফেসররা কালো চামড়ার ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় কম নাম্বার দেন।

লোকমানকে এক সিঙ্গাপুরিয়ান চায়নিজ প্রফেসর বলেছিল, পিএইচডি সবার জন্য নয়।

লোকমানের আমেরিকার কলারাডো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় রেকমেন্ডেশন লেটারে আরেক সিঙ্গাপুরিয়ান চায়নিজ প্রফেসর লিখেছিল, Can be admitted with reservation।

ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে লোকমান বলেছিল, America is superpower, because they give value to merit, not to black or white skin.

আমার চায়নিজ সুপারভাইজার Leong Lai Peng-ও ঠিক একই কথা লিখেছিলেন আমার ক্ষেত্রে।

আমার অস্ট্রেলিয়ান কো-সুপারভাইজার R.P Bettens-এর অধীনে শাদা চামড়ার চায়নিজ ছাত্র ভালো কোনো রেজাল্ট ছাড়াই টপাটপ পিএইচডি-র জন্য মনোনয়ন পেয়ে যায়। অন্যরা ভালো রেজাল্ট নিয়েও ঝুলে থাকে।

ইরানি এক সহযোগী প্রফেসর যিনি বিশ্বের সেরা একশজন ইনভেস্টিগেটর বা গবেষকের মধ্যে একজন নির্বাচিত হয়েছিলেন তাকে সহযোগী প্রফেসর পদে এখানকার অথরিটি উন্নীত হতে দেয়নি।

পরে তিনি যখন আমেরিকার পেনসেলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ফুল প্রফেসর হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ পেলেন তখন এরা তাকে রাখার জন্য শুরু করে মায়াকান্না। কিন্তু তিনি *শিট তোমার এসোসিয়েট প্রফেসরশিপ, শিট সিঙ্গাপুর* বলে গত ২৪ ডিসেম্বর আমেরিকা চলে যান।

আমরাও বসে নেই। এখানকার পাট কোনো রকমে আল্লাহ আল্লাহ করে শেষ করে আরো বড় এবং সুবিধাজনক ক্ষেত্র খুজে পাবো এই প্রত্যাশায় আছি।

সিঙ্গাপুর থেকে

থ্রি কমরেডস

– মুন হাসান

গত এক বছর যাবৎ টেক্সাসের আরলিংটন শহরে আছি। এটি ডালাস-ফোর্টওয়ার্থ মেট্রপ্লেক্সের মাঝামাঝি একটি ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রিক শহর। আমি এখানে এসেছি এফ-২ ভিসা নিয়ে যা সাধারণত ছাত্রদের স্বামী-স্ত্রীকে দেয়া হয় তাদের পড়াশোনার সময়ে এক সঙ্গে থাকতে দেয়ার একটি সুযোগ হিসেবে।

প্রবাস আমার প্রবাস

প্রথম প্রথম প্রবাস জীবন অসহ্য লাগতো। এখনো লাগে। ভালোলাগার মতো অনেক কিছুই থাকা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে ঢাকা শহরের বিষাক্ত বাতাসকেই অনেক বেশি কাম্য মনে হয়। সময় সব কিছুকেই সহনীয় করে তোলে। এখন আমার ঢাকার ব্যস্ত অফিস আর টুরের কথা ফ্যাকাশে স্মৃতি বলে মনে

হয়। এখানে অসংখ্য বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের মতো আমিও একটা গ্যাস স্টেশনে কাজ করি। যদিও আইনত কাজ করা দণ্ডনীয়!
প্রতিনিয়ত আমাকে বিভিন্ন শ্রেণীর আমেরিকানদের সংস্পর্শে আসতে হয়। আজকের লেখায় প্রধানত আমার উপলব্ধির পাশাপাশি তাদের কথাও থাকবে।

থৃ কমরেডস

প্রতিটি গ্যাস স্টেশনের মতো আমার গ্যাস স্টেশনেও কিছু নিয়মিত গ্রাহক আছে। যাদের কাজ হচ্ছে নিয়মিত ক্রেটের পর ক্রেট বিয়ার কেনা এবং পান করা। এরা বেশির ভাগই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী। এরা ঘণ্টা হিসেবে কাজ করে এবং দিনের শেষে পে-চেকের সিংহ ভাগই ঢেলে দেয় বিয়ারের পেছনে। দুনিয়া সম্পর্কে এরা থোড়াই কেয়ার করে। এমনকি ইরাকের যুদ্ধ নিয়েও এরা চিন্তিত নয়। দিনের শেষে বিয়ার না পেলে বা গ্যাসের দাম বাড়লে এরা বিমর্ষ হয়, চিন্তিত হয় আগামীকালের বাড়তি খরচের জন্য। প্রেসিডেন্ট বুশ যা বলছে বা করছে এটা নিয়ে এদের অধিকাংশেরই মাথা ব্যথা নেই।
এবার একটু এদের তিন জনের বা থৃ কমরেডসের পরিচিতি দিই। বুড়ো ভার্ন একাশি বছরের বৃদ্ধ যুবক। কিছুদিন আগে সাইকেল থেকে পড়ে নিতম্বের এবং হাতের হাড় ভেঙে ফেলেছেন। তিনি কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকান সৈনিক ছিলেন। এখন একটি ফার্নিচার কম্পানিতে কাজ করেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আস্ত মাতাল হয়ে গার্লফ্রেন্ডকে পেটান!
বুড়ো এড, চশমাধারী এই লোকটির বয়স বাষট্টি বছর। চার সন্তানের জনক। তিনি সাবেক আমেরিকান আর্মির সার্জেন্ট হিসেবে ভিয়েতনাম আগ্রাসনে অংশ নিয়েছিলেন। বর্তমানে সংসার, ছেলেপুলে ছেড়ে আমার গ্যাস স্টেশনের উল্টো দিকের একটি মোটেলে থাকেন এবং অন্য বন্ধুদের সঙ্গে সন্ধ্যায় কাজ শেষে বিয়ার পানের প্রতিযোগিতা শুরু করেন।
বুড়ো ল্যারী। সম্ভবত এদের মধ্যে সবচেয়ে অবস্থাপন্ন, রসিক এবং নারীমোহন। তিনি *ডালাস স্টারস আইস হকি* টিমের সহকারী ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেন। তিনিও এড-এর মতো ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বর্তমানে লাইন ধরে বাকি বন্ধুদের সঙ্গে বিয়ার পানে আর নারী প্রতিযোগিতায় টক্কর দেন। সম্প্রতি তিনি ভার্নকে টক্কর দিয়ে তার এক গার্লফ্রেন্ডকে বিয়ে করেছেন। ফলে ইদানিং তার গাড়িতে করে ভার্নকে বিয়ার কিনতে আসতে দেখা যাচ্ছে না।
পাঠকরা নিশ্চয়ই কিছুটা বীতশ্রদ্ধ এতো বিবরণে? আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই প্রমাণ করা যে আমেরিকা একটি মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্তপ্রধান দেশ এবং তাদের বহু নাগরিককেই একটা সময়ে কোনো না কোনো যুদ্ধে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেতে হয়েছে। তারা অধিকাংশই জানে না তারা কেন যুদ্ধটা করেছে? আমিও হয়তো আমেরিকায় না থাকলে এই সত্যটা উপলব্ধি করতে পারতাম না।

কিশোরী লিয়ার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা

আমার অত্যন্ত প্রিয় একজন মহিলা কাস্টমার আছে যার নাম জেনিফার। সে খুব উদার প্রকৃতির বাচাল একজন মহিলা। প্রতিদিন বাড়ি পরিষ্কার, গৃহস্থালির টুকটাক কেনাকাটার সময় তার স্বামী, মেয়েদের গল্প করে। মজার এই মহিলার ছোট মেয়ে লিয়া সম্প্রতি *যোলোফ* নামে একটি এন্টি

ডিপ্রেশন ওষুধ খেতে হচ্ছে এবং এর জন্য তাদের মাসিক খরচ আড়াইশ ডলার বেড়ে গিয়েছে। তাই সে আমায় বলেছিল, একটা নতুন কাজ দেখতে হবে।

বললাম, কেন?

তখন সে আমাকে একটি ভয়াবহ ঘটনা শোনালো যা শুনে আমেরিকার একটি বীভৎস দিক আমার সামনে এলো।

লিয়া আর তার এক জাপানিজ বান্ধবী একদিন গৃন ওকস নামে একটি অভিজাত এলাকায় বারবিকিউ পার্টিতে যাবার সময় চারজন মাতাল হিস্পানিক তাদের পথ আটকায়। এবং তার জাপানিজ বান্ধবীকে জোর করে গাড়িতে উঠিয়ে চলে যায়। এর প্রায় তিন দিন পর মেয়েটিকে পুলিশ উদ্ধার করে মৃত অবস্থায়। মাতালগুলো অবিরাম পাশবিক ধর্ষণ শেষে মৃত মেয়েটিকে ফেলে যায় ট্রিনিটি নদীর পাশের নো ম্যানস ল্যান্ডে। এ ঘটনাটি চোদ্দ বছর বয়সী লিয়া আর তার পরিবারকে একটি বীভৎস অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছে। পুলিশ অবশেষে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে ওই চার হিস্পানিককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের বিচার চলছে। বাংলাদেশের মতো এখানেও জঘন্য সব অপরাধ হয়। কিন্তু তফাত হলো, এখানে এরা সাধারণত ঠুনকো কোনো কারণে অপরাধীদের ছেড়ে দেয় না।

বিশেষ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া

আমেরিকা নাইন ইলেভেনের পরবর্তী সর্তকাবস্থা হিসেবে এখন পর্যন্ত প্রায় পচিঁশটি দেশের ষোল বছরের উর্ধে বয়সের পুরুষ নাগরিকদের যারা ননইমিগ্রান্ট ভিসায় আমেরিকায় এসেছে তাদের গতিবিধি নখদর্পণে রাখার জন্য বিশেষ রেজিস্ট্রেশন নামে একটি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এর ফলটা হয়েছে দুর্দশাজনক। অধিকাংশ ননইমিগ্রান্ট ভিসা হোল্ডারই এ দেশে ওভারস্টে করেছেন। এবং এখানেই বাড়ি, ব্যবসা কিনে থিতু হয়েছেন। এদের অনেকের ছেলেমেয়েও এখানে পড়াশোনা করছে। এদের এখন একটাই ভয় যদি রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে ডিপোর্ট করে দেয়?

আমার গ্যাস স্টেশনের মালিক আলী গত দুই মাস যাবৎ এই ভয়ের কারণে ঠিক মতো ব্যবসায় মন দিতে পারছে না। কারণ তার ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী এখানে এসেছিল অন্যদের পাসপোর্টে। অবশেষে অধিকাংশ ইলিগ্যালদের মতো সেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেজিস্ট্রেশন না করার। তবুও আমেরিকায় থাকতেই হবে। ধন্য আমেরিকা!

অসম আচরণ

যদিও আইএনএস অর্থাৎ আমেরিকার ইমিগ্রেশন অধিদফতর বলছে, পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশকেই এ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হবে তবুও বাংলাদেশি হিসেবে আমার মনে কিছু যৌক্তিক প্রশ্ন জেগেছে।

এক. বাংলাদেশ যদি তার অভ্যন্তরীণ সহিংস ঘটনার জন্য এই তালিকাভুক্ত হয় তাহলে ইনডিয়া তার আসাম তথা সেভেন সিস্টার্স এবং উত্তর ইনডিয়ান হিন্দু উগ্রপন্থীদের ঘটানো সহিংসতার জন্য কেন তালিকাভুক্ত হবে না?

দুই. একইভাবে শ্রীলংকা (তামিল সহিংসতা) বা নেপাল কেন নয়?

তিন. লবিইংয়ের মাধ্যমে আর্মেনিয়া যদি এ তালিকা থেকে নিজেদের নাম আমেরিকার মতো প্রভাবশালী দেশকে দিয়ে উঠিয়ে নিতে পারে তাহলে বাংলাদেশ কেন নয়?

প্রশ্নগুলোর জবাব শেষ হয়ে যায় ধর্মকে টেনে আনার পর যা একজন সুস্থ, চিন্তাশীল মানুষকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নাৎসি বাহিনীর ইহুদি বিদ্বেষকে মনে করিয়ে দেয়।

আমার কেবল মনে হচ্ছে, পাঠকরা আমার লেখা পড়ে আমেরিকার নেগেটিভ দিকটাই দেখতে পাবে যা আমার কাম্য নয়। কারণ এখানকার সাধারণ মানুষ অনেকটা ইনডিফারেন্ট, তারা পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এসব খতিয়ে দেখে না। এরা মিডিয়া নির্ভর এবং কিছুটা হুজুগে। এদের হুজুগের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে *অরেঞ্জ অ্যালার্ট* ঘোষণা এবং এর ফলে হোম ডিপো, অফিস ডিপো নামে চেইন হার্ডওয়ার ও অফিস সামগ্রী বিক্রির প্রতিষ্ঠানগুলোতে *ডাকট টেপ* এবং পলিথিন কেনার জন্য আমেরিকানদের হুড়োহুড়ি।

ঘটনাটির শুরু হোমল্যান্ড সিকিউরিটির কর্তাব্যক্তিদের অসংলগ্ন কিছু সোর্স থেকে পাওয়া উড়ো খবরে। তারা আমেরিকানদের বলেছে, আল-কায়েদা পবিত্র হজের সময়ে কেমিকাল বা বায়োলজিকাল অথবা নিউক্লিয়ার আক্রমণ করতে পারে বলে ইন্টিলিজেন্স সূত্র জানিয়েছে। আর হুজুগে আমেরিকানরা অনেকেই এ ভয়ে বাড়িতে একটি ঘর *ডাকট টেপ* আর *পলিথিন* দিয়ে মুড়ে রেখেছে! অনেকে আরো সাবধান! তারা গ্যাস মাস্ক এবং পোশাক কিনে প্রস্তুত আক্রমণের জন্য। রীতিমতো হাস্যকর। এ পরিস্থিতি যখন প্যানিকের পর্যায়ে তখন মিডিয়াগুলো জনসাধারণকে শান্ত হয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলছে!

যাহোক, এদের মাঝেও চমৎকার কিছু মানুষ রয়েছে। তাদেরই দুজনের কিছু সংলাপ দিয়ে আমার লেখাটি শেষ করবো। প্রতিদিনের বিয়ার কেনা শেষে আজ আমি, এড আর ল্যারিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের ভিয়েতনাম যুদ্ধের কিছু স্মৃতি আমায় বলো? এড যা বললেন তা বঙ্গানুবাদ করলে দাড়ায় –

তোমার সমস্যাটা কি বলো তো? তুমি কি আবিষ্কার করতে চাও? আমি ওসব দিনের কথা মনে করতে চাই না। এটা বুঝতে পারো না?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে যুদ্ধে কেন গিয়েছিলে?

এড বললো, আমাকে বলা হয়েছিল যুদ্ধে যেতে, কোনো উপায় ছিল না। এবং দয়া করে আমাকে কখনো এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।

বৃদ্ধ এড তার বিয়ারের প্যাক নিয়ে আস্তে আস্তে হেটে রাস্তা পার হয়ে চলে যাচ্ছেন তার *অস্থায়ী* নামের স্থায়ী ঠিকানায়। কিছুটা বিরক্ত আমার ওপর...। কিন্তু আমার মনে হলো, হয়তো এভাবেই তিনি শান্তি খুজে বেড়াচ্ছেন এক সময়ের হিংস্র আগ্রাসনের ভয়ানক স্মৃতি থেকে পালিয়ে।

আমার পাশে তখনো ল্যারি দাড়িয়ে প্রতিদিনের মতো হাসতে হাসতে বললেন, কেন এতো যুদ্ধ আর অতীত নিয়ে ভাবো যুবক? মঙ্গলবার রাতে তারা দেখবে আমাদের সঙ্গে? উপরি হিসেবে রাতের নিস্তব্ধতা আর হাড় কাপানো হাওয়া?

আমি সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম।

আরলিংটন, টেক্সাস থেকে

কৃতজ্ঞ

– সাহানা ইসলাম

তখন সময়টা ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাস। স্কলারশিপ নিয়ে স্বামীর উচ্চ শিক্ষার্থে জাপানে গমন। তারপর আমিও এলাম স্বামীর কাছে বাবা–মা, ভাই–বোন, শ্বশুর–শাশুড়ি, আত্মীয়–স্বজন সবার স্নেহ–মমতা, ভালোবাসা ছেড়ে। সবার জন্য প্রচণ্ড মন খারাপ থাকে। আমার মন ভালো করার জন্য স্বামী কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসার প্রস্তাব করলো। সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেলাম। কারণ আমরা দুজনেই ঘুরে বেড়াতে খুব পছন্দ করি।

ঠিক হলো সেতোওহাসি দেখতে যাবো। ছুটির দিন সকাল নয়টায় আমরা দুজন স্টেশনের উদ্দেশ্যে বের হলাম। স্টেশনে পৌছানোর পর সমস্যায় পড়লাম টিকেট কাটা নিয়ে। কারণ আমরা জাপানে এসেছি মাস খানেক আগে। কাজেই জাপানিজ ভাষা তেমন বুঝি না। সে তবুও কিছুটা বোঝে, আমি একেবারেই বুঝি না। আর জাপানিজরা ইংরেজি বোঝে না। দুই একজন যাও বোঝে তাও আবার জাপানিজ ইংরেজি। অর্থাৎ জাপানিজ ভাষায় ইংরেজি উচ্চারণ করে। এই যেমন ধরা যাক, বাংলাদেশকে বলে *বাংগুরাদেসু*। বাসকে বাসু আর অ্যালার্জিকে বলে *এরারুসি*। এখন ভেবে দেখুন অবস্থা।

যাহোক, অনেক কষ্টে বোঝানো সম্ভব হলো যে, আমরা সেতোওহাসি যেতে চাই, টিকেট কিভাবে কাটবো দেখিয়ে দেয়ার জন্য। জাপানিজরা সহযোগিতাপরায়ণ জাতি। একবার কেউ তাদের সাহায্য চাইলে যেভাবেই হোক সাহায্য করবে। তাই টিকেট পেতে আমাদের সমস্যা হলো না। তারপর ট্রেন যাত্রা শুরু হলো।

কয়েকটা টানেল পেরিয়ে স্টেশনে পৌছালাম। তারপর আবার বাসযাত্রা শুরু হলো। এই বাস সেতোওহাসি যাবে। বাস বিভিন্ন পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে একবার উপড়ে উঠছে তো একবার নিচে নামছে। ছবির মতো সুন্দর দেশ জাপান। রাস্তা–ঘাট, বাড়ি সব কিছুই পরিপাটি। কোথাও কোনো ময়লা আবর্জনা নেই। এক কথায় পটে আকানো ছবির মতো। চার পাশের দৃশ্য দেখে মনটা ভালো হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণে আবার আমার ছোট্ট দেশটার কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারণ আমি বিশ্বাস করি আমাদের দেশটাকে এভাবে সাজিয়ে রাখলে এই দেশের চেয়ে একশগুণ সুন্দর দেখাবে। যাহোক, অবশেষে পাহাড়ের উচু নিচু, আকাবাকা পথ পেরিয়ে আমরা সেতোওহাসি পৌছালাম।

সেতোওহাসি হচ্ছে একটা বৃজ। সমুদ্রের ওপরে কয়েকটা দ্বীপের ওপর দিয়ে এই বৃজ নির্মিত হয়েছে। জায়গাটার নাম হচ্ছে সেতো আর ওহাসি হচ্ছে লম্বা বৃজ। অসম্ভব সুন্দর চার পাশের প্রকৃতি। সমুদ্রের মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ। এই দ্বীপগুলোকে সংযোগ করেছে এই বৃজ। আমাদেরকে একটা টুরিস্ট স্পটে নামিয়ে দেয়া হলো।

পাশেই শপিং সেন্টার এবং রেস্টুরেন্ট। আমরা সেখানে কিছু কেনাকাটা করে অনেক ছবি তুললাম এবং দুপুরের খাবার সারলাম কোনো মতে। কারণ জাপানিজ খাবার তখন আমি একেবারেই খেতে পারি না।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চললো। এবার বাড়ি ফেরার পালা। আমরা যে বাসে করে এসেছিলাম সেই বাসের ড্রাইভারের কাছ থেকে ফিরতি বাসের সময় জেনে নিয়েছিলাম। সন্ধ্যা ছয়টায় আমাদের বাস। জাপানের বাসগুলোতে সব জাপানিজ ভাষায় অর্থাৎ কঞ্চিতে লেখা কোন জায়গার কোন বাস। এই ফাকে বলে নিই, জাপানে তিন ধরনের অক্ষর রয়েছে। *হিরাগানা, কাতাকানা* আর *কঞ্চি*। এই কঞ্চি চায়নিজ অক্ষর আর এর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি।

ফিরে আসি মূল গল্পে। ছয়টা বেজে গেল। বাস স্টপে অনেক বাস আসতে লাগলো। আমরা যেহেতু বাসের লেখা পড়তে পারি না সেহেতু আন্দাজের ওপর একটা বাসে ওঠে পড়লাম। ভাবলাম এটাই আমাদের বাস। বাস ছাড়তে যাবে এমন সময় পেছনের বাস থেকে ড্রাইভার নেমে এসে এই বাসের ড্রাইভারকে কি সব বললো এবং আমাদের আকার-ইঙ্গিতে, কিছুটা ইংরেজিতে কিছুটা জাপানিজ বোঝালো যে এই বাস আমাদের গন্তব্যের বিপরীতে যাচ্ছে। এই বাসে যদি যাই তাহলে আমাদের অনেক ঝামেলা হবে এবং অনেক অর্থ ব্যয় হবে। ফলে তার বাসে ওঠার জন্য অনুরোধ করলো।

আমরা দুজনে এই ড্রাইভারের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। একটু হলেই আমরা দুজন রাতের বেলা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে যাচ্ছিলাম। আমরা বিদেশি এবং নতুন এসেছি শুনে তিনি আমাদের খুজে বের করে তার বাসে উঠিয়ে নিয়েছেন। জাপানিজদের এই রকম মানবিকতায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে গেল। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে তার মুখটি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ওকাইয়ামা, জাপান থেকে

আনা হাব্বাক ইনতা

– এম.এ মালেক

ঘটনাটি আমার আপন ছোট ভাইয়ের প্রবাস জীবনের। ঢাকায় আমার বাসা থেকে এইচএসসি পাস করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে বিএ-তে ভর্তি হয়। উক্ত কলেজের নির্বাচনে ভিপি পদে সামান্য ভোটের ব্যবধানে অকৃতকার্য হওয়ায় বেশ কিছুটা ডানপিটে হয়ে যায়। কলেজ এবং মহল্লায় আধিপত্য বহাল রাখতে মারামারি ও ফাটাফাটি তার নিত্যদিনের ঘটনা।

ভাইদের মধ্যে আমি সবার বড় এবং সে সবার ছোট। তবুও এতোটা ব্যবধান ডিঙিয়ে দুইজনের মধ্যে একটা নীরব বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বিএ ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার পরেই মা-বাবার পরামর্শে ও উদ্যোগে ভালো একটা চ্যানেলে তাকে সউদি আরবে পাঠিয়ে দেয়া হয়। চাকরির চুক্তি শেষে দেশে আগমন। স্বাস্থ্য ও চেহারায় বিরাট পরিবর্তন দেখে সবাই খুশি। টাকাও ভালো এনেছে। একদিন আমাকে বললো, বড় ভাই, গোপন কথা আছে। ছোট ভাইয়ের জবানীতেই তার অভিজ্ঞতার কথা লিখলাম।

কম্পানিতে চাকরি শেষ পর্যায়ে। মনে করলাম, পার্টটাইম করে কিছু অতিরিক্ত টাকা উপার্জন করা দরকার। সেই সুবাদে ইতিমধ্যে আরবি ভাষাটা বেশ ভালোভাবেই শিখে ফেলেছি। সকাল সাতটা থেকে দুইটা পর্যন্ত কম্পানির চাকরি শেষে অফুরন্ত সময়। বিকেলবেলায় আমার মেসের নিকটবর্তী বড় বড় বাড়িগুলোর সামনে দাড়িয়ে কেবল বলতাম, *আগাবা ফিসুগল* (কাজ আছে কি না)।

এভাবে চেষ্টার পর প্রায় দশ দিন পর এক বাড়ির মালিক গেটে দাড়ানো ছিল। বয়স আনুমানিক ষাট পয়ষট্টি হবে। আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে থাকিয়ে বললেন, *ফি সুগল* (কাজ আছে)।

ভেতরে নিয়ে গেলেন। কাজ দেখালেন। কাপড় ইস্ত্রির কাজ। সপ্তাহে পাচ দিন। বেতন বাংলাদেশি টাকায় প্রায় দশ হাজার।

আনন্দে আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় করলাম। বাড়িটি রিয়াদের মালাস এলাকায়। মেস থেকে হেটে যেতে প্রায় পনেরো মিনিটের রাস্তা। সোনায় সোহাগাই বটে। পরদিন থেকে কাজ আরম্ভ করলাম। এক ফিলিপিনো মধ্য বয়সী চাকরানী গেট খুলে দিল। বিরাট আলিশান বাড়ি। আমার ব্যবহার ও কাজে মালিক খুবই খুশি। প্রতিদিনই আগে নাশতা, পরে কাজ।

প্রায় এক মাস পর হঠাৎ একদিন এক অপরূপ সুন্দরী যুবতী ইস্ত্রি করার রুমে ঢুকলো বোরখাবিহীন। বয়স বাইশ তেইশ হবে। কিছুটা হতবাক হয়ে হাতের কাজ বন্ধ রেখে চেয়ে থেকে মাথা নামিয়ে রাখলাম। ভুবনমোহিনী হাসিতে বললো, *এস ইছমু* (তোমার নাম কি)।

নাম বললাম।

নামটি বোধহয় তার খুব পছন্দ হয়েছে। রুমের ভেতরে অহেতুক হাটাকাটি করতে লাগলো। আমার কাজেও ছন্দপতন হচ্ছে। এক সময়ে সে চলে গেল।

সারাক্ষণ ভাবতে লাগলাম, মেয়েটি মালিকের কি হয়? মেয়ে, নাকি স্ত্রী? পরে এ চিন্তা বাদ দিলাম। কারণ যদি কোনো অজানা বিপদ ঘটে যায়।

অবাক হতে লাগলাম। পরবর্তীকালে যখনই কলিংবেল টিপতাম তখন ফিলিপিনো চাকরানীর বদলে ওই যুবতী মেয়েটি প্রতিদিন নিজে অতি সুমধূর মিষ্টি কণ্ঠে বলতো, *মিন ইনতা* (তুমি কে)। আমার উত্তর শুনে হাসি মুখে নিজে গেট খুলে দিতো। ডাইনিং রুমে নিজ হাতে রকমারি দামি নাশতা পরিবেশন করে খেতে দিতো। আমি ভাবতাম, গরিব দেশের মানুষ। তাই দয়াপরবেশে এটুকু আদর–যত্ন।

এমন দামি খাবার খেতে খেতে স্বাস্থ্য ও দেহের উন্নতি দেখে মেস এবং কম্পানির বন্ধুরাও অবাক। এভাবে ভালোই চলছিল। কিন্তু মেয়েটি প্রতিদিন আমার কাজের সময় কখনো চেয়ারে বসে অথবা কাছে দাড়িয়ে দামি পারফিউমের গন্ধ ছড়িয়ে এমন মিষ্টি মধুর কণ্ঠে কথাবার্তা বলতো যে, আমি দিন দিন আরো অবাক হতে লাগলাম।

আরবিতে তার প্রশ্নের আমার জবাবগুলো শুনে সে বেশ চমককৃত ও আনন্দিত হয়ে আমার মুখের দিকে কামনাময়ী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো এবং মিটি মিটি হাসতো। কথায় কথায় সে জেনে নিয়েছে আমি অবিবাহিত। এরপর থেকে দামি ফলমূলসহ আমার নাশতার পরিমাণ ও তার ঘেষাঘেষি আরো বেড়ে গেল। আমি তখন নানান রকম চিন্তায় আচ্ছন্ন এবং ভাবতে লাগলাম, এগুলো কি আমার প্রতি তার পছন্দের ভালোলাগা নাকি, ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ? এর পরিণাম তো মোটেই ভালো হবে না আরব আইনে।

একদিন দেখলাম সে অন্যদিনের তুলনায় যেন এক অপরূপা সাজে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে মুচকি হাসিতে ডানাকাটা পরীর মতো রুমের এদিক–ওদিক নাচের ভঙ্গিতে হাটছে আর বলছে আজ কোনো

কাজ করতে হবে না, আজ অন্য কাজ। এই বলে আমার খুব কাছে এসে ফিশ ফিশ করে বললো, *আনা হাব্বাক ইনতা* (আমি তোমাকে ভালোবাসি।

এ কথা শোনার পর আমি নির্বাক। সর্বশরীর কাপতে আরম্ভ করলো। আমার নীরবতাই কাল হলো। সে হঠাৎ করে রুমের বাতিগুলো ঝটপট নিভিয়ে অতি দ্রুত আমার কাছে এসে সামনাসামনি দাড়িয়ে আমার দুই কাধে দুই হাত রেখে তার মুখটিকে এতো কাছে নিয়ে এসেছে যে, তার মেয়েলি শারীরিক মিষ্টি মধুর গন্ধ ও উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আমাকে বিহ্বল করে ফেললো।

ক্ষণিকের চিন্তায় স্থির করলাম, পবিত্র দেশের মাটিতে তার যৌন আহবানে কি সাড়া দেয়া উচিত হবে? জীবনে অনেক কিছু করেছি। কিন্তু কোনো নারীর দেহকে অবমাননা করিনি। আজ এ মুহূর্তে এ বাড়ির মালিক হয়তো বা আমাদের এ কাজটি দেখতে পাচ্ছে না সত্য। তবে জগৎ সংসারের মালিক তো সবই দেখছে। ভাবলাম, আমাকে এই যৌন কামনা–বাসনার পরিস্থিতি থেকে বাচতেই হবে। যেই চিন্তা সেই কাজ।

আমি তৎক্ষণাৎ তার বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে অতি দ্রুত দূরে সরে হাপাতে লাগলাম। সে আহত বাঘিনির মতো আমাকে লক্ষ্য করে গালে এক থাপ্পড় দিয়ে বসলো এবং লাইটগুলো জ্বালিয়ে এমন রাগান্বিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কি করবে চিন্তা করতে লাগলো।

আমি তো ভয়ে চুপচাপ। মাথা নামিয়ে দাড়িয়ে রইলাম।

সে চেয়ারে বসে কাপগ–চোপড় ও চুল ঠিকঠাক করে কি ভেবে যেন হঠাৎ বললো, তোমার বেয়াদবির শাস্তিস্বরূপ এ রুমের সব আসবাবপত্র এদিক থেকে ওদিকে স্থানান্তর করতে হবে।

আমি নিশ্চুপ। প্রায় দুই ঘণ্টার মতো আমাকে অযথা কাজ করিয়ে রাগে রুম থেকে বের হয়ে গেল। মুহূর্তে ভাবলাম, এ যাত্রায় তো রক্ষা পেলাম। কিন্তু তারপর? তার আহবানকে অপমানিত করার বদলায় সে যদি চিৎকার করে বলে ফেলে যে, আমি তাকে একা পেয়ে তার শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করেছি তাহলে এ দেশের আইনে আমার মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য।

তাই রুম থেকে বের হয়ে ফিলিপিনো চাকরানীর মাধ্যমে বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলবো বলে ডেকে আনলাম এবং বললাম, *আনা মাফি সুগল ইনতা বেত* (আমি আপনার বাসায় আর কাজ করবো না)।

মালিক বললেন, *লে ইনতা মাফি সুগল* (কেন কাজ করবে না)।

আমার সহজ উত্তর, দেশে মা অসুস্থ। তাই চলে যাবো।

মালিক কিছুক্ষণ চুপ থেকে কি যেন ভাবলো এবং বললেন, ঠিক আছে, আরেকদিন এসে বেতনের টাকা নিয়ে যেও।

ভয়ে আর বেতন আনতে যাইনি। কারণ প্রবাসে এ জাতীয় যৌন ভালোবাসার খপ্পরে পড়ে যদি জীবনটা চলে যায়। আরো ভাবলাম, ভালোবাসার শেষ পরিণতি কি যৌন মিলন? মূল চাকরির চুক্তি শেষ হতে আরো ছয় মাস বাকি ছিল। বলা তো যায় না, দুজনের কারো সঙ্গে হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যায়। তাই অফিস ও মেসের বাইরে যেতাম না। চুক্তি শেষে সুষ্ঠু মতোই দেশে ফিরলাম।

ঘটনাটি বলতে বলতে অধোমুখে বিষণ্ন আধার ছড়িয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলো সে। স্বগত সংলাপে অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, বড় ভাই, স্মৃতি বড় বেদনাময়, কেবলি জ্বালায়! প্রবাসে আমার জীবনে আসা

এরূপ ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান করার পেছনে যুক্তি হিসেবে, পবিত্র দেশে মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রাপ্তির ভয়ে ভীত হয়ে বিরত রইলাম। আবার ভাবি, নাকি সততার সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পথ সুগম করার জন্য এটুকু করলাম। কোনটি সত্য? আজও বুঝে উঠতে পারছি না!

কথাগুলো বলে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি কেবল মাথা নেড়ে বললাম, দুটিই সত্য। তবে পরেরটিই বেশি সত্য। একমাত্র বিবেকবান এবং সংযমী পুরুষরাই এ জাতীয় ঘটনার ত্বরিত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আমার কথায় ভাইটি খুশি হলো বলেই মনে হলো।

বাসাবো, ঢাকা থেকে

জননী ও জন্মভূমি

– আজহার উদ্দিন

আমার প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা নিতান্তই স্বল্প। এর মধ্যে একটি কষ্টকর অভিজ্ঞতার ঘটনা যাযাদিতে একবার লিখেছিলাম। এছাড়া তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। হয়েছে একটি উপলব্ধি। এটি দূর পরবাসে না গেলে আমার অন্তত হতো কি না সন্দেহ। এবং যথার্থ মর্মোপলব্ধি হতো না রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রেমের স্বদেশ পর্বের গানগুলো। বিশেষত *আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে, ও আমার দেশের মাটি, কেন চেয়ে আছো গো মা, একবার তোরা মা বলে ডাক* গানগুলো। সে কতোকাল আগে রচিত তবু আজো কতো প্রাসঙ্গিক।

এবার উপলব্ধির কথাটি বলি। সেটি হচ্ছে মা এবং মাতৃভূমি। ভিন দেশে গেলে যথার্থ উপলব্ধি ঘটে জননী ও জন্মভূমি কতোখানি সমার্থক। ছিলাম মরু অঞ্চল কুয়েতে। প্রথম তিন দিন কার্যত ঘরের ভেতরে ঘোরের মধ্যে কাটালাম। তিন দিন পর যখন বাইরে বের হলাম তখন দেখি অন্য রকম পথঘাট, ভিন্ন রকম ঘরবাড়ি, উল্টো পথের উল্টো পাশে স্টিয়ারিংওয়ালা সারি সারি গাড়িগুলো এবং ভেতরের মানুষেরও নয় আমাদের মতো।

যেন চকিতে জ্ঞান ফিরে পেলাম। বুঝলাম আমি এই মুহূর্তে স্বদেশে নেই, সুদূর বিদেশে। এখানে আমার কাছের মানুষ কেউ নেই। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, তখন আমার বুকের ভেতর কেবল সব হারানোর হাহাকারই নয়, দুই চোখের জলের ধারায় ভাসতে থাকলাম। রীতিমতো হাউ মাউ করে কাদতে লাগলাম। আমার এই শিশুসুলভ কান্না দেখে এক ইনডিয়ান অবাঙালি তো বিব্রতকর অবস্থায়ই পড়ে গেলেন।

অনর্গল হিন্দিতে কতো সান্ত্বনা যে দিলেন তার সামান্যই বুঝলাম এই বাঙাল আমি। তিন মাস চলে গেল। কিন্তু বাঙালের কান্না ফুরালো না। বুঝলাম আমার হবে না। এ যে রীতিমতো অস্তিত্বের সংকট। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম আর নয়, আমি ফিরে যাবো আমার স্বদেশে, আমার জন্ম জন্মান্তরের মাতৃভূমিতে। গোল্লায় যাক আমার বিত্তবাসনা। চুলোয় যাক আমার পেট্রো ডলার।

ওরা বলে, সে তো থার্ড ওয়ার্ল্ড।

আমি বলি ওই থার্ড ওয়ার্ল্ডই আমার গর্ব, আমার অহংকার তোমরা যাই বলো। সে যে আমার প্রিয়তমা মাতৃভূমি।

আমার আবেগ ভরা কণ্ঠ শ্রবণে ইনডিয়ানটি বললেন, তুমি তো খুব বললে। কিন্তু তোমাদের লিডাররা তো তা বোঝেন না এবং বলেনও না।

এ যেন জিভ কাটো লজ্জায়। তাই লজ্জাবনতচিত্তে অথচ রবীন্দ্র গর্বে গেয়ে উঠলাম রবীন্দ্র বাণীই...

এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে

আপন মায়েরে নাহি জানে

এরা কি দেবে তোরে কিছু না কিছু না

মিথ্যা কহে শুধু কতো কি ভানে...

প্রবাসী বন্ধুরা শুনলে অবাক হবেন। তবু বলি, শেষ পর্যন্ত এগারো মাসের মাথায় সত্যিই আমি চলে এসেছি আমার *ছেড়া কাথা আছে পাতার দেশ* বাংলাদেশে।

আরেকটি কথা বলি প্রবাসী বন্ধুদেরকে, আপনারা কখনো যদি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রেমের স্বদেশ পর্বের গানগুলো শোনেন তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারাও প্রিয় মাতৃভূমির জন্য কাদবেন এবং ফিরে আসতে চাইবেন। আর ফিরে এসে আমার মতো গাইবেন, *যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়বো না মা...।*

অর্থপ্রেমীদের কথা অবশ্য ভিন্ন। সকলেই যদি আমার মতো বাঙাল হয়ে দেশে ফেরেন তবে এই *থার্ড ওয়ার্ল্ড* নামে চিরদুঃখিনী বাংলাদেশটির বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের বারোটা বাজবে মনে রাখবেন। এমনিতেই অর্থগৃধ্নু এবং ক্ষমতাগৃধ্নু বুশ-ব্লেয়ারের যুদ্ধ থাবায় হয়তো অনেক কুয়েতি প্রবাসীদেরকে বিজেপির মেড ইন ইনডিয়া *পুশ ইন* করতে হবে যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। হায় খোদা! একদিকে বাজপেয়ির ঠেলা-ধাক্কা, আরেকদিকে যুদ্ধোন্মাদ বুশ-ব্লেয়ারের ঠেলা-ধাক্কা। এতো ঠেলা-ধাক্কা আমরা এই ক্ষীণবলে সামাল দেবো কিভাবে!

মানিকগঞ্জ থেকে

নারী

– জালাল উদ্দিন

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন পিসি পাসপোর্টে কুয়েত চলে যাই। ভিসা ছিল একটি ক্লিনিং কম্পানির। ভিসায় লেখা ছিল বেতন চল্লিশ দিনার। কুয়েতে যাবার পর শুনেছি ভিসার কাগজে বেশি বেতন দেখিয়ে বাংলাদেশিদেরকে বিদেশে নেয়া হয় এবং মিডল ইস্ট-এর অনেক দেশে গিয়ে বাংলাদেশিরা ন্যায্য বেতন পায় না। আমিও পাইনি। চল্লিশ দিনারের জায়গায় বাইশ দিনার পেতাম।

অথচ আমাদের সমান কাজ করেও একই কম্পানি থেকে ইনডিয়ান ও ফিলিপিনো আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বেতন পায়।

আমার বন্ধু মনজু বলে, আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রথম দিকে একটু সুদৃষ্টি দিলে নাকি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো।

আমাদের আল আবরাক কম্পানির হাসাবিয়াস্থ চার নাম্বার ব্যারাকে থাকতাম। হাসাবিয়ায় প্রচুর বাঙালি বসবাস করেন। এ এলাকায় গেলে মনেই হতো না বিদেশে আছি। চারদিকে প্রচুর বাঙালি।

হাসাবিয়ার যে ব্যারাকে থাকতাম সে ব্যারাকের দুই বিল্ডিং পেছনের বিল্ডিংয়ে কয়েকজন পতিতা বসবাস করতো। এসব পতিতাদের দালাল হিসেবে বাঙালি লোকই কাজ করতো। কুয়েতে খাদ্দাম ভিসা বা অন্যান্য ভিসা নিয়ে যাওয়া অনেক বাঙালি, শ্রীলংকান, ফিলিপিনো মেয়ে কুয়েতিদের বাসা থেকে তাদের অত্যচারের কারণে পালিয়ে যেতো। তাদেরকে অনেক বাঙালি নামমাত্র বিয়ে করে দেহ ব্যবসায় নামিয়ে দিতো। পুলিশ সেসব বাসা রেইড দিলে দালালরা কাগজপত্র দেখিয়ে বলতো, তারা স্বামী-স্ত্রী।

আমাদের ব্যারাকে যেতে হলে ওই বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় দালালরা নিচু স্বরে বলতো, কি দেশি, লাগবে? ভালো মাল আছে।

মনজুর কাছ থেকে শুনেছি, বাঙালি ও শ্রীলংকান মেয়েদেরকে আড়াই থেকে তিন দিনার, ফিলিপিনো মেয়েদেরকে পাচ দিনারে পাওয়া যায়। ইজিপশিয়ান, লেবাননি আট থেকে দশ দিনারে পাওয়া যায়। আট দিনারে বাংলাদেশের এক হাজার দুইশ টাকার বেশি হয়। এক সিটিংয়ে এতাগুলো টাকা খরচ করতে প্রবাসী বাঙালি, ইনডিয়ান, পাকিস্তানি, শ্রীলংকান ও অন্যান্য লোকরা যেতো। নিঃসঙ্গ বাঙালিরা বেশি যেতো।

ক্লিনিং কম্পানিতে বেতন সাধারণত মাসের ১ তারিখ দিয়ে দেয়। আমাদের বেতন নিয়ে এক নাম্বার ব্যারাক থেকে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যেতো। আসার পথে ওই বিল্ডিংয়ে অনেক লোককে ঢুকতে দেখতাম। আমার হবিগঞ্জের বন্ধু রউফ বলতো, ১ তারিখ রাতে এসব মেয়েদের কাছে গিয়ে মজা পাওয়া যায় না। কারণ তারা জানে যতো দ্রুত কাজ শেষ করে লোক বের করে দেবে ততো বেশি লোক ঢোকানো যাবে এবং ততো বেশি দিনার রোজগার করতে পারবে। অন্যান্য সময় হলে ভালোভাবে নাকি গল্পগুজবও করা যায়।

আমার কাজ ছিল আল সাবপোস্ট অফিসে। সকাল ছয়টায় কম্পানির গাড়িতে উঠে আমরা যার যার গন্তব্যে চলে যাই। দুপুর দুটোয় কম্পানির গাড়ি আমাদেরকে নিয়ে আসে।

আমার কাজের জায়গার সুপারমার্কেটে অনেক বাঙালি কাজ করতো। সেখানে প্রায় সবার সঙ্গে পরিচয় হলো। প্রবাসে এক বাঙালি আরেক বাঙালির দেখা পেলে খুশি হয়। ঢাকার দোহার এলাকার নজরুল নামের একটি ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম প্রত্যেক কুয়েতিদের বাসায় দুই থেকে চারজন করে খাদ্দামা (পরিচারিকা) থাকে। বেশির ভাগই বাঙালি ও শ্রীলংকান মেয়ে। কারণ বাঙালি ও শ্রীলংকান মেয়েদের কম বেতনে পাওয়া যায়।

নজরুল জানালো, ১২ নাম্বার বাসায় কাজ করে শ্রীলংকান মেয়ে। মেয়েটি সুপারমার্কেটে প্রায়ই আসে। সে থেকেই পরিচয়। তারপর ভালোবাসা। কুয়েতি বাসা থেকে চলে যাবার পর নজরুল ডিউটি ফাকি দিয়ে বা কখনো সুপারভাইজারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সে বাসায় ঢুকে পড়ে। মেয়েটির নাম অনুরাধা। সে ঠিক করেছে মেয়েটিকে বিয়ে করবে।

নজরুলকে বললাম, কুয়েতির বাসায় এভাবে যাওয়া-আসা করা ঠিক নয়। যদি ধরা পড়ে যাও তাহলে সমস্যা হবে। কুয়েতিরা বাঙালিদেরকে ভিক্ষুকের জাতি মনে করে।

নজরুল এসব কথাকে পাত্তা দিল না। ভালোবাসা থাকলে এমন হয়। কেউ কাউকে ভালোবাসলে হাতি দিয়ে টেনেও সে ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে সরানো যায় না।

এর প্রায় দুই মাস পরের কথা। নজরুলকে কয়েকদিন ধরে দেখতে না পেয়ে তার সহকর্মীর কাছে তার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে লোকটি জানালো, নজরুল ও অনুরাধা এখন জেলখানায় অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করছে। দুপুরে বাসায় কুয়েতি কি জন্য যেন এসে নজরুল ও অনুরাধাকে গল্প করতে দেখে ফেলেছে। তাই দুজনকে থানায় দিয়েছে।

ভালোবাসার অপরাধে কুয়েতি পুলিশরা নজরুলকে উলঙ্গ করে তার পুরুষাঙ্গে একটি ইট বেধে ঝুলিয়ে শাস্তি দিচ্ছে। অনুরাধাকেও উলঙ্গ করে তার স্তনের সঙ্গে ইট ঝুলিয়ে শাস্তি দিচ্ছে। নজরুলের সহকর্মীটি থানায় ক্লিনিং কম্পানির বাঙালি লোকদের কাছ থেকে তা জানতে পেরেছে।

নজরুল ও অনুরাধার শাস্তির কথা শুনে তাদের জন্য আমার দুই চোখের অশ্রু ঝরানো ছাড়া করার কিছু ছিল না। প্রবাসীরা অসহায়। অসহায় মানুষ অশ্রু ঝরানো ছাড়া কিছু করতে পারে না।

মৌলভীবাজার থেকে

হাল

– মুখতার হোসাঈন খান

মানুষের জীবনে প্রবাস যাপন, বিশেষ করে ছেলেদের বেলায় এটা এক প্রথা হয়ে দাড়িয়েছে। সবাই গিয়েছে বা যাচ্ছে, আমিও যাবো এ আশা মনে উকি দেয়। বার বার সুযোগ পেলেই সোনার হরিণ ধরার আশায় মানুষ পাড়ি দেয় বিদেশ লাখ লাখ টাকা খরচ করে। অনেক সময় পৈতৃক ভিটা–বাড়িও বিক্রি করতে কুন্ঠা বোধ করে না।

এদের যুক্তি হচ্ছে, বিদেশ যাওয়ার ব্যয় মানে পুটি দিয়ে বোয়াল শিকার। কিন্তু এক সময় দেখা যায় পুটি পচে–গলে ঝরে গেলেও বোয়ালের কোনো খবর থাকে না। এমনো হয় যে, নবপরিণীতা বধূর মেহেদির রঙ মোছার আগেই তার স্বামী পাড়ি জমায় বিদেশে। বছরের পর বছর অপেক্ষার পর স্বামী বাড়ি আসে না।

তারপরও মানুষ বিদেশের আশা ছাড়ে না। আমার পরিবারেও কিছুদিন আগে বয়ে গেল প্রবাসের বৈরী হাওয়া। এই প্রবাস যে সবার জন্য আশীর্বাদ নয়, কারো কারো জীবনে সর্বনাশও বয়ে আনে তার প্রমাণ আমাদের পরিবার।

আব্বা একটি সরকারি চাকরি করতেন। সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠার চাকরিটিতে তিনি যা বেতন পেতেন তা দিয়ে আমাদের দিনগুলো মাছ–মাংস খেয়ে না হলেও শাক–সবজিতে এক রকম চলে যেতো। একদিন সেই বোয়াল ধরার প্রত্যাশায় সরকারি চাকরি ছেড়ে নানার দুটো হালের গরু এবং মায়ের গয়না বিক্রি করে আব্বা চলে যান বিদেশে। বিদেশি আইন–কানুন সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না তার। মাত্র চার মাসের ভেতর এক জায়গার ভিসা নিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় কাজ করার অপরাধে সে দেশের পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বেআইনিভাবে কাজ করার দায়ে বিশ দিনের জেল এবং ভিসা বাজেয়াফত করে আবার স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়। দেশে ফিরে সরকারি চাকরি, বিদেশে সব হারিয়ে সারাক্ষণ হাহুতাশে মগ্ন থাকেন। ছয় সাতজনের সংসার কি করবেন কিছুই যেন বুজে উঠতে পারছেন না।

অগত্যা আমাকেই ধরতে হয় সংসারের হাল। ছোট ভাইদের খুশি আর মায়ের মুখের হাসি দেখার জন্য নেমে গেলাম বেচে থাকার জীবন যুদ্ধে। সেই থেকে স্বদেশেই পরবাস যাপন করছি।

চট্টগ্রাম থেকে

রোমন্থন

– শরীফ মোতাহার হোসেন

পরীক্ষা শেষ। অছাত্র ক্যাডারদের উপদ্রবে হল ছেড়ে এক আত্মীয়ের বাসায় উঠি। হাতে অফুরন্ত অবসর। সময় কাটতেই চায় না যেন। অনেক দিন ধরে হংকং কর্মরত এক বন্ধুর আহবানে *ত্রিরত্ন* নামে খ্যাত আমি, হারুন, বকুল পরীক্ষার রেজাল্ট পর্যন্ত সেখানে কাটানোর উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি দেশ ত্যাগ করি।

ছোট এই দ্বীপটির কথা গল্পে পড়েছি। মানুষের মুখেও শুনেছি। নিজ চোখে দেখে বিস্ময়ের সীমা নেই। রীতিমতো আমি মুগ্ধ, অভিভূত। হংকংয়ের দুঃসময় চলছে তখন। বিদেশি অনেক ব্যবসায়ী তল্পিতল্পাসহ দেশটি ত্যাগ করতে শুরু করেছে। জোর করে দখলে রাখা হংকং কয়েক বছর পরই চুক্তি মোতাবেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃটিশদের চায়না সরকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

চুংকিং ম্যানশনে থাকি। অনতিদূরে আকর্ষণীয় কাওলুনবে। এ স্থানে প্রায় সার্বক্ষণিক উপচেপড়া পর্যটকদের ভিড়। বিভিন্ন দেশি মানুষের মধ্যে অনেক স্বদেশি। কেউ হংকং-এ কাজ করছে, কেউ বা বিরতি নিয়ে সুযোগ-সুবিধা মতো নানান দেশে যাওয়ার জন্য প্রহর গুণছে। দালালদের আখড়া। অনেক বাংলাদেশিদের ধান্ধাবাজি চোখে পড়ার মতো। তবে পাকিস্তানিদের চাতুর্যের ধারেকাছে এরা নয়। ইনডিয়ানরা ব্যবসা করছে। বিদেশি শ্রমিকদের কাজের পরিধি অপ্রতুল।

কেউ কেউ টাকা দিয়ে, পরিচিত ব্যক্তি উদ্যোগে কাজ জুটিয়ে নিলেও অনেকের পক্ষে কাজ পাওয়া ছিল দুষ্কর। বলতে গেলে এদের মধ্যে আমি ব্যতিক্রমি ছিলাম। সেখানে সামাসাপুর নামের স্থানে সকালে বেকার শ্রমিকদের হাট বসতো। মালিকরা এসে দরদাম করে লোক নিয়ে যেতো।

আমাদের দেশেও এমনটি দেখা যায়। পর্যটক ভিসায় অবৈধভাবে কাজ করার জন্য পুলিশ প্রায়ই সেখানে হানা দিয়ে হয়রানি করতো, ধরে দেশে পাঠিয়ে দিতো।

আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই দিন আগে নিজেই টিকেট কেটে দক্ষিণ কোরিয়া পাড়ি জমাই। ওই সময় কোরিয়া এয়ারপোর্ট শিথিল থাকাতে ব্যাপক হারে লোক ঢোকার সুযোগ পেয়েছিল। কোরিয়ায় হঠাৎ করে শিল্পের প্রসারতা এতো ব্যাপক বেড়ে গিয়েছিল যে, বিদেমি কর্মঠ শ্রমিক ছাড়া অনেক কারখানা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন জনৈক যাত্রীকে ইমিগ্রেশন অফিসার বললো, শো ইউর ডলারস।

শুয়ে থাকতে বলেছে ভেবে যাত্রীটি মেঝেতে শুয়ে পড়ে। ইংরেজি কিছুই বলতে পারে না এমন লোককে দালাল শিখিয়ে দিতো, আই কান্ট স্পিক ইংলিশ।

মুখস্থ করলেও এয়ারপোর্টের জৌলুস অফিসারদের দেখে ভুলে গিয়ে বলে ফেলতো, আই ক্যান্ট স্মোকিং ইংলিশ।

এই ধাচের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত অনেক লোকই সুযোগ পেয়ে কোরিয়া প্রবেশ করেছে। আমিও এদের সঙ্গে কাজ করেছি। অনেকের চিঠি লিখে দিয়েছি, চিঠি পড়ে শুনিয়েছি। হঠাৎ করেই এভাবে যাওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। আর এখন কোরিয়া যাওয়া তো সোনার হরিণ ধরার মতো।

প্রায় ৭০% পাহাড়বেষ্টিত উচু-নিচু দেশটিতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন গিয়েই লক্ষ্য করেছি। প্রচণ্ড শীত হলেও পর্যাপ্ত উপকরণের জন্য শীতের তীব্রতা সহজেই মানিয়ে নেয়া যায়। পরাধীনতা ও স্বাধীনতার পরবর্তী অনেক সময় ধরে বেশ কষ্ট করে আজকের অবস্থানে এসেছে এরা। কম্পানির বাসায় থেকে ফ্যাক্টরিতে কাজ করি।

আমাদের পাচ বাঙালির পাশাপাশি কোরিয়ান নারী-পুরুষ শ্রমিক থাকে। ওই দেশে কেউ লুঙ্গি পরে না। কিন্তু আমরা কেউ পরে বের হলে নিষেধ করে। একদিন বিকেলে কোরিয়ানদের মেলা দেখার সময় লুঙ্গি পরিহিত আমাদের একজনকে সহকর্মী কোরিয়ান মহিলা লুঙ্গি খুলে দিগম্বর করে দেয়।

লজ্জায় আমরা এতোটুকু হয়ে গেলেও এদের কোনো ভাবান্তর দেখিনি সেদিন। ব্যাপারটি নিয়ে কম্পানিতে বেশ কয়েকদিন হাসির খোরাক সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে কাজ, ভাষা দুটিই রপ্ত হয়ে গেছে।

একদিন এক মধ্যবয়সী রমণী কাজের অবসরে আমাকে প্রশ্ন করে, তোমাদের দেশের মহিলারা কাপড়ের নিচে প্যান্টি পরে না?

আমি না বলতেই রসিক মহিলা পাল্টা প্রশ্ন করে বলে, তাহলে গোপনাঙ্গে ধূলোবালি ঢোকে না?

এভাবে কঠিন শ্রমের দেশে নানান প্রসঙ্গ, হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে সময় পেরিয়ে যেতো। অমানুষিক পরিশ্রম করে দিনের পর দিন কেটে যেতো শুধু অর্থের জন্য। কম্পানি, বাস, রেল গাড়ি, দোকানপাট সর্বত্র প্রত্যক্ষ, পরোক্ষভাবে অপমানিত হতে হতো গরিব দেশের অধিবাসী হওয়ার কারণে।

অপেক্ষাকৃত ধনী দেশের লোকদের মর্যাদা, কদর দেখে মন বিষণ্ণতায় ভরে উঠতো। কোরিয়ার সংখ্যাধিক্য মানুষের আচার-আচরণে বেশ রূঢ়তা ফুটে উঠতো। তাই নিত্যদিনের ক্ষুদ্রতা, নিচুতার সংজ্ঞা আপোস করতে করতে মনটা ছোট হয়ে যেতো। আমাদের দেশের নারী স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হলেও কোরিয়ান নারীরা স্বাবলম্বী হবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনচেতা।

এক সঙ্গে কাজ করতে করতে আমার সঙ্গে এক কোরিয়ান মেয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিদেশে বাংলাদেশিদের কর্মদক্ষতা প্রশংসিত, বিপরীতে দুর্নাম কম নয়।

একজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেক সময় অনেককে বহন করতে হয় দৈবক্রমে। পরস্পর হানাহানি, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্য খুবই সমস্যা হয়। তাই আমার পরকীয়ার কথা জেনে অজানা ভয়ে বন্ধুরা অনুরোধ, উপদেশ, সতর্ক করে দেয়। কিন্তু প্রবাসের নিঃসঙ্গতা একাকিত্ব ঘোছাতে যে নারী মঙ্গলদীপ নিয়ে আমারই জন্য দাড়িয়ে থাকে তাকে কি সহসা ছাড়া যায়!

ব্যাপারটি মহিলার স্বামী দেবতার কানে গেলে আমাদের উভয়কে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে পুলিশের কাছে যায়। আমাকে এই বলে দেশে পাঠিয়ে দেয়, যাও বাছাধন দেশে গিয়ে পরকীয়া করো গিয়ে।

প্রবাসের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে দেশে ফিরে বুকভরা নিঃশ্বাস নিয়ে ফিরে আসি। সত্যি বলছি, প্রবাস জীবনের চেয়ে স্বদেশে ঢের ভালো আছি।

মাদারীপুর থেকে

ছিয়ানব্বই ঘণ্টা

– ম. আলম

আমাদের রফতানিকারক ইনডিয়ার রৌহিত চৌহানের সঙ্গে ছিল আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা। হিন্দি ভাষী ভদ্রলোক ভালো বাংলা বলতে পারেন। বাংলাদেশে তাকে নিয়ে আমার অনেক প্রোগ্রাম হয়েছে। আকার–ইঙ্গিতে আমাদের কমপিউটার সেকশনের মেয়েটার কথা বলতে চাইলেও এড়িয়ে যেতাম আমি।

শেখ হাসিনার অসহযোগ আন্দোলনের সময় বেনাপোলে আটকা পড়লাম। খবর পেয়ে চৌহান ওপার থেকে এসে জোর করেই কলকাতায় নিয়ে গেলেন। বেনাপোল হোটেলে বসে হাসিনা এবং আওয়ামীদের উদ্ধার করা ছাড়া আসলেই আমার কোনো কাজ ছিল না।

রাত আটটার দিকে চৌহান এসে আমাকে বললেন, *তুমহারা ছেক হাছিনা তো তুমলোগকো ছুট্টি দে দিয়া, চলো দার্জিলিং থাকর মৌজ মানাকর আয়ে।*

কোচে উঠে আকাশি রঙয়ের শাড়ি পরিহিতা বিশ একুশ বছরের এক প্যারাগন অফ বিউটির পাশে বসতে বলে বললেন, *আপ উনকো সাথ যাইয়ে...*

মেয়েটা সিট থেকে উঠে দুই হাত জড়ো করে নমস্কার জানিয়ে বললো, আই শ্যাল ওয়েট ফর ইউ।

চৌহানকে বললাম, তোমার সিট কোনটা?

তিনি বললেন, *হাম বিছ রাস্তেমে আফসে মিলেগে।*

তার মানে?

আরে ইয়ার গাড়িমে কোই বাত না কর না।

ইতিমধ্যে গাড়ি চলতে শুরু করলো।

চৌহান মেয়েটাকে বললেন, শর্ম্মা, অল দি বেস্ট। টেক কেয়ার অফ মাই ফ্রেন্ড। অলওয়েজ।

নেমে পড়লেন চৌহান।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটা আমাকে বললো, এক্সকিউজ মি, আই ক্যান স্পিক ইংলিশ, বেঙ্গলি অ্যান্ড হিন্দি। হোয়াট ল্যাংগুয়েজ ডু ইউ প্রেফার? এনিওয়ে, আমি বাঙালি পরিবারের মেয়ে। আমার নাম সুর্বণা শর্ম্মা।

কপালের ঘাম মুছে বললাম, চৌহান কি হয় আপনার?

আমি ওনাদের কলকাতায় অফিসের স্টাফ। প্লিজ, আমাকে তুমি করে বলুন।

আগে তো ওই অফিসে আপনাকে দেখিনি।

আমি আগে তাদের দিল্লি অফিসে ছিলাম। এক মাস হলো এখানে জয়েন করেছি।

চৌহান কোন জায়গা থেকে উঠবেন?

তিনি দার্জিলিং যাবেন না। আপনি যে কয়েকদিন থাকতে চান আপনাকে দেখাশোনার দায়িত্ব চৌহানজি আমাকে দিয়েছেন। বলতে পারেন, আমি আপনার গাইড।

বুঝতে বাকি থাকলো না চৌহানকে আমাদের ওই মেয়েকে ম্যানেজ করে দিতে পারিনি বলে উল্টো...।

ভ্রমণ পথে চৌকস এবং সুদর্শনা সুর্বণার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সকালে দার্জিলিং নেমে সুর্বণা বললো, আমরা এখন সাত হাজার একশ ফিট উচুতে। সাবধান স্যার, এখানে মেয়েরা কানে কানে কথা বলে। সামনেই চিরহরিৎবর্ণ দিগন্ত প্রসারিত সুমহান কাঞ্চনজঙ্ঘা। কাল প্রভাতে দেখাবো সোনা গলানো তরঙ্গায়িত রেখায় উদ্ভাসিত অপরূপা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। বার্চ হিল থেকে সূর্যাস্তও চমৎকার স্যার।

রক ভ্যালি রোডের হোটেল ভ্যানেটাইনোতে একটা রুম নিলাম দুজনে। পর্দা সরিয়ে সুবর্ণা বললো, জানেন দার্জিলিং নামটাতেই বৈচিত্র আছে। *দোজে* অর্থাৎ ব্রজ থেকেই *দোরজিলিং* বা বজ্রপাতের দেশ থেকেই দার্জিলিং নামের সূচনা। দ্বিমতে দুর্জয়লিঙ্গ বা তিব্বতি ভাষায় বিশাল পাহাড়ই হলো দার্জিলিং। এক কথায় অপরূপা, তাই না? কি ভাবছেন বলুন তো? গরম জলে স্নান সেরে নিন, নাশতা করে মল (Mall)–এ যাবো।

বললাম, তোমার কথা, রূপ–গুণ সব কিছুই ভালো লাগছে আমার। কোথাও যাবো না, আজ শুধু তোমার কথাই শুনবো।

কি যে বলেন মশাই।

সত্যিই তোমার কাছ থেকে অনেক শেখার আছে আমার।

সে হবেখণ। ঝটপট করুন স্যার।

মলে লাগোয়া রাস্তা জুড়ে দোকানে পশমের তৈরি নানান বসন। পাহাড়ি ভূষণের অনেক কিছু। থংকাস, জপমালা ব্রাসের নানান মূর্তি, গোর্খা ছুরি, কুকরি রকম–সকম কিউরিওর পসরা – টুকটাক কিনলো সে। একটা সিল্ক শাড়ি, পারফিউম কিনলাম তার জন্য। নিতে রাজি হলো এক শর্তে যদি চৌহানকে এসব না বলি।

সুবর্ণার প্রতি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লাম। আমি অবিবাহিত, আটাশ বছরের টগবগে যুবক তখন। তার কাছে বসে বললাম, প্রেম–ভালোবাসায় জড়িয়েছো কখনো?

বাবু, এ জন্যই তো দিল্লি ছেড়ে কলকাতায় এসেছি। আমার পুরো ফ্যামিলিই তো ওখানে। এখানে জেঠামশাই আছেন। জানেন, একজন আমার জন্য পাগল। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না তাকে। বিয়ে করতে চায় আমাকে। জানি, এতো বড়লোকের ছেলে কখনো বিয়ে করবে না। তার ফ্যামিলি রাজি হবে না। আমার শরীরের বিনিময়ে তার কাছ থেকে মুক্তি চেয়েছি। নাহ, বিয়ে সে আমাকে করবেই...।

এসব চৌহান জানে?

হয়তো জানেন, ঠিক বলতে পারছি না।

কে সে? কোথায় থাকে?

থাকে দিল্লিতে। নাম বলা যাবে না।

চৌহান তাকে জানে?

ওনার ঘনিষ্ঠজন, তাকে বিয়ে করলে চৌহানজি আমাকে খুন করে ফেলবেন। চাকরিটাও যাবে আমার। চারটা বিয়ারের অর্ডার দিলে সুবর্ণা বললো, আপনাদের বড়লোকের এ অভ্যাসটা আমার অপছন্দ। মাতাল হয়ে বলবেন, সুবর্ণা, আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললাম, আমার মনের কথাটাই তুমি বলেছো।

উচু স্বরে হেসে বললো, আমাকে পটাতে হবে না স্যার।
বিয়ারে চুমুক দিয়ে বললাম, তোমাকে নিয়ে অন্য কোনো চিন্তা করছি না আমি।
সে বললো, করলেও ক্ষতি নেই। দুজনে এক সঙ্গে রাত কাটাবো চৌহানজি কি মনে করবেন, আমাকে আপনি ছেড়ে দিয়েছেন? আপনাকে খুশি করতে পারলেই চাকরিটা থাকে আমার। চলুন বার্চ হিলে গিয়ে সূর্যাস্ত দেখবো।
আমাকে রাজি করাতে না পেরে একাই চলে গেল সুবর্ণা।
রাগের মাথায় আরো তিনটা বিয়ার খেলাম। সুবর্ণা এসে আমার মাতাল অবস্থা দেখে রুম চেঞ্জ করে আরেকটা দামি রুমে নিয়ে গেল আমাকে।
সারা রাত হুশই ছিল না আমার।
ভোর চারটায় আমাকে জাগিয়ে বললো, কেমন মানুষ আপনি? উঠুন, সানরাইজ দেখতে টাইগার হিল যাবো। গাড়ি রেডি।
এবারও রাজি হলাম না আমি।
এই প্রথম সুবর্ণা আমার বুকে মাথা রেখে বললো, রাতে আপনি যা যা বলেছিলেন সব কথাই রাখবো যদি এখন টাইগার হিলে যান।
কি বলেছিলাম আমি?
আপনি আমাকে বাংলাদেশে নিয়ে যাবেন, বিয়ে করবেন আমাকে। মনে নেই?
সূর্য ওঠার আগেই জিপে চড়ে টাইগার হিলে পৌছালাম। উদিত সূর্যের ডোরাকাটা বিচ্ছুরণ থেকেই নাকি টাইগার হিলের জন্ম। বিস্তৃত হিমালয় দৃশ্যমান হিল থেকে। উদিত সূর্যালোকে ক্ষণে ক্ষণে রঙের বদল, গোলাপি থেকে পিংক। সত্যি চমৎকার ওই দৃশ্য।
ওই রাতেই অপ্সরী সুবর্ণা ধরা দিল আমার একটি শর্তে। বাংলাদেশে গিয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে আমার ঘরনী হবে সে।
এক সময় তৃপ্তির আহ্লাদে সুবর্ণা বলেছিল, প্লিজ, টেক মি উইথ ইউ টু বাংলাদেশ।
মনে মনে শেখ হাসিনার অসহযোগকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছিয়ানব্বই ঘণ্টার মধুচন্দ্রিমা শেষ করে কলকাতায় ফিরলাম দুজনে। কনফার্মড হতে পরদিন চৌহানের অফিসে গিয়ে দেখি আমার হবু বধূ কাজে ডুবে আছে।
দেশে ফিরে এসে ফোনে টানা ষোল দিন কথা হলো। কথা ছিল নির্দিষ্ট দিনে বিমানে সে ঢাকা চলে আসবে।
কিন্তু হঠাৎ সুবর্ণা হাওয়া হয়ে গেল।
পাগল হয়ে ছুটে গেলাম কলকাতায়। কোথাও তাকে পেলাম না। নিজের মধ্যেই অসহযোগ আন্দোলন দানা বেধে উঠলো।
ঝগড়া বাধিয়ে দিলাম চৌহানের সঙ্গে। তার এক কথা, সুবর্ণাকে কেউ নিয়ে পালিয়েছে।
সব ভুলে পাগল প্রায় আমি দুই মাস দিল্লিতে তাকে খুজে বেড়ালাম।
অবশেষে অর্ধ দেবদাস আমাকে চৌহান ধরে নিয়ে এসে বললেন, সুবর্ণাকে তোমার ওপর অভিমান করে দার্জিলিং পাঠিয়ে খুব ভুল করেছিলাম। দিল্লিতে সুবর্ণার প্রেমে আমার ছোট ভাই হাবুডুবু

খাচ্ছিল। জানতে পেরে এখানে নিয়ে আসি তাকে। দিল্লিতে থেকে যায় ছোট ভাই। হঠাৎ করে কলকাতায় এসে এক রকম কিডন্যাপ করে নিয়ে সুবর্ণাকে বিয়ে করেছে সে। কোথায় আছে জানি না। মানসম্মানের ভয়ে চুপ ছিলাম।

এ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য চৌহান আমার হাত ধরে কান্না শুরু করলেন।

দীর্ঘ অর্ধযুগ পরেও দার্জিলিংয়ের সেই ছিয়ানব্বই ঘণ্টার প্রবাস স্মৃতির কথা মনে পড়লে অসহযোগ আন্দোলনের মতো আমার সব কিছু স্থবির হয়ে যায়।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

পেট্রদিনার

– গোলাম মোস্তফা

১২ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বিকালে পাচটায় বাহরেইন পৌছি দেশে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য। এয়ারপোর্টে প্রয়োজনীয় কাজ শেষে ছয়টায় বের হয়ে আসি। এসে দেখি প্রতিবেশী অপেক্ষমাণ। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। কারণ বিমান দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা দেরিতে আসে।

যাক সে কথা। এখন প্রবাসের ঘটনা। ছিলাম ফ্ৃ ভিসার। এখানে এসে শুনি এ জাতীয় ভিসার লোক ধর–পাকড় চলছে। বাৎসরিক চেকআপ। এই অবস্থায় কাজে না যাওয়ার জন্য সবার পরামর্শ। কি আর করা, সবই নিয়তির খেলা। প্রায় দেড় মাস পর জিপিজেড কম্পানিতে কাজ শুরু করি। এ জাতীয় কম্পানিতে হালকা কাজ খুব কম। সবই ভারী কাজ। হালকা যা আছে তা ওই পুরনো লোকদের দখলে। নতুনদেরকে ভারী কাজই করতে হয়। এ জন্য আমাকেও সেটাই করতে হচ্ছে।

খুবই পরিশ্রম। পরিশ্রমের ধকল সহ্য করতে না পেরে বুক ফেটে কান্না আসতো। অনেক কষ্টে সে কান্না সংবরণ করতাম। শুধু স্ত্রী–সন্তান ও আর্থিক চিন্তায়। এভাবে তিন মাস। তিন মাসে সাতত্রিশ দিন মাত্র কাজ। কারণ একাধারে করতে পারি না। দুই তিন দিন কাজ করি আবার দুই তিন দিন বসে থাকতে হয়। অতীত জীবনে লেখাপড়া ও চাকরি ছাড়া কোনোদিন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করিনি। হাতের কবজি ও কনুইতে প্রচণ্ড ব্যথা, যন্ত্রণায় ছটফট করি। এক সপ্তাহ কাজে যেতে পারি না। তাই কাজ চলে যায়। পরে অন্য প্রাইভেট কম্পানিতে কাজ নিই। সে একই কাজ, একই ধারাবাহিকতায় করতে হয়। এ ছাড়া উপায় নেই। একাধারে করতে গিয়ে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে এখানে আমাকে দেখার মতো কেউ নেই। যারা দুজন আছে তারা থাকে দূরে। কাজ ফেলে দেখাশোনা করা সম্ভব না। এ দুজন হচ্ছে নাসির ও মনির। ছোট ভাইয়ের মতো যারা আমার এনওসি এবং ভিসা সংক্রান্ত সহযোগিতা করেছে।

এখানে কাজ করছি ও আশপাশের সবাইকে বলেছি অফিশিয়াল, মার্কেট, দোকান ও হোটেল এ জাতীয় কাজের সন্ধান থাকলে জানানোর জন্য। নিজেও চেষ্টা করছি সেই ভিত্তিতে অলিউল্লাহ নামে হোমনা থানার এক ছেলে বাহরেইনের অন্যতম পাচতারা হোটেলগুলোর একটিতে যোগাযোগ করতে বলে। নিজস্ব প্রয়োজনে হোটেলটির নাম উল্লেখ করলাম না। আমি ওর কথামতোই ওই হোটেলে যাই।

সিকিউরিটির কাছে আমার সিপিআর বা সেন্ট্রাল পপুলেশন রেজিস্ট্রেশন কার্ড জমা দিই। সে আমার নাম লিপিবদ্ধ করে আমাকে পার্সনেল ম্যানেজারের রুম দেখিয়ে দেয়। আমি অনুমতিক্রমে রুমে প্রবেশ করি। তিনি আমাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আমি সামান্য সময় নিয়ে দেশে আমার ছাত্র অবস্থা, চাকরি জীবন এবং এখানে আসার পর নিদারুণ কষ্টকর কাজের কথা বলি। আরো অনুরোধ করি, আমাকে হোটেলে যে কোনো একটি কাজ দেয়ার জন্য।

তিনি আমার কথা শোনেন, অন্য একজনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আমি তার সামনেই বসে থাকি। আলোচনা শেষে তিনি আমাকে একটি ফরম দেন এবং বলেন আমার ভিসা, সিপিআর, মেডিকাল রিপোর্ট, মালিকের সিপিআর-এর ফটোকপিসহ ফরমটি পূরণ করে পরের দিন জমা দিতে। পরিশেষে বলেন, চাকরির নিশ্চয়তা একশ ভাগ। ইনশাআল্লাহ্ তোকে আর কষ্ট করতে হবে না।

এ কথা শুনে আমি আনন্দিত। মনে মনে ভাবি বিধি বুঝি ফিরে তাকালো। চলে আসি। যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই বলি এতোদিনে আমার কষ্টের শেষ হলো। একটা কাজ পেলাম।

পরদিন কাগজপত্র নিয়ে যাই। এবং দেখা করি। তার কাছে যা শুনি তাতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। কারণ তিনি আমার জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে পারিবারিক প্রভাবসহ বিস্তারিত বলতে থাকেন। এবং এও বলেন, এসব কথা তাকে এক লোক টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছে।

তিনি কাজের ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করলেন, আবারও অনুরোধ করলাম।

তখন তিনি বললেন, আমি কি করবো বল, তোমার দেশের লোক ভালো না।

প্রথম তার কথা অবিশ্বাস্য মনে হলেও পরে বিশ্বাস করলাম যৌক্তিক কারণে। তার তো আমার পারিবারিক অবস্থান জানার কথা না। কতো ভাই, কতো বোন, কোন ভাই কি করে ইত্যাদি।

বিধি বাম। কি আর করা। ভগ্ন হৃদয় নিয়ে পুরনো কাজে মনোনিবেশ করলাম। প্রচণ্ড গরম, শরীর থেকে অবিরাম ঘাম ঝরে, যেখানে দাড়াই সে জায়গা ভিজে যায়। মাঝে মধ্যে দুই একজনকে হাসপাতালে নিতে হয়। কারণ অত্যাধিক ঘামে শরীর পানি শূন্য ও দুর্বল হয়ে জ্ঞান হারানো, তারপর কাজ করি। এতোদিনে শরীর কিছুটা সয়ে গেছে।

প্রতিদিন তিনশ সাড়ে তিনশ তাবুক (তাবুক ইটের বিকল্প, ছোট ছোট পাথর ও সিমেন্টে তৈরি) নাড়াচাড়া করতে হয়। এক তাবুকের ওজন ত্রিশ পয়ত্রিশ কেজি। এগুলো লাগানোর জন্য ষোল থেকে আঠারো আরবানা বালুর সঙ্গে বারো বস্তা সিমেন্ট মেশাতে হয়। তা আবার বালতিতে করে দেয়। এভাবে প্রতিদিন কাজ করতে হয়। মাঝে মধ্যে নাসির দেখতে যেতো। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে আসতো। এমন অবস্থায় একদিন প্রচণ্ড গরমের তাড়নায় খালি গায়ে কাজ করার সময় নাসির যায় এবং আমাকে এমন বেশে দেখে সে আর সহ্য করতে না পেরে দাড়ায়নি।

এক সপ্তাহের মাথায় রাত নয়টায় সে আমাকে খবর দেয় পরদিন দেখা করার জন্য। আমি আসি এবং এক স্পেয়ার মোটর পার্টসের দোকানে কাজ পাই। আজ চার মাস যাবৎ এখানে আছি, ভবিষ্যতেও যেন থাকা যায় সে চেষ্টা অব্যাহত। আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো শোকরিয়া, কষ্টের অবসান হলো।

হোটেলের চাকরি না হওয়ার কারণ যা জেনেছিলাম তা হলো, আমার পারিবারিক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতিহিংসার শিকার আমি। কামনা করি এই প্রবাসে আমার মতো প্রতিহিংসার শিকার

যেন কেউ না হয়। এ বিদেশ–বিভূইয়ে সবাই যেন *ভাই ভাই ঠাই ঠাই* অবস্থান করি। একের সুখে অন্যরা সুখী হই। অনুরূপ কারো দুঃখে সমবেদনা ও সর্ব সহযোগিতার হাত বাড়াই।

বাহরেইন থেকে

সামুদ্রিক

– নিদ্রা

প্রবালভাইয়াকে প্রথম দেখেছিলাম নিউ ইয়র্কের সেই দোতলা বাড়ির বারান্দা থেকে। তুষার পড়া রাস্তা দিয়ে যখন গেট খুলে ভেতরে ঢুকছিলেন তখন দোতলার বারান্দায় কফির কাপ হাতে বসে থাকা আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন প্রায় সাত আট সেকেন্ড। ফর্শা, চশমা পরা ছেলেটিকে আমিও প্রথমে চিনতে পারিনি। পরে চিনতে পারলাম। জাফরচাচার একমাত্র ছেলে।

আমার বাবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু জাফরচাচা আর নাদিয়াচাচির বাসায় রয়েছি আপাতত। এসএসসি পরীক্ষার পর যখন লাগামহীনভাবে বেড়াচ্ছি ঠিক তখনই এক অ্যাকসিডেন্টে আমার পায়ের সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে গেল। ডাক্তারের পরামর্শে অপারেশন করানোর জন্য তিন মাসের জন্য আমেরিকায় চলে এলাম। মায়ের প্রেগন্যান্সির কারণে বাবাও আসতে পারলেন না। সত্যি কথা বলতে কি, এখানে এসে নাদিয়াচাচি ও জাফরচাচার আদরের জন্য বাবা–মাকে একটুও মিস করিনি। আমেরিকায় এসেছি আজ দুই দিন হলেও প্রবালভাইয়াকে আজই প্রথম দেখলাম। কারণ এ কয়েকদিন তার বন্ধুদের সঙ্গে তিনি শহরের বাইরে ছিলেন।

ভাইয়ার সঙ্গে কথা হলো আরো দুই দিন পরে। বাংলাদেশে আমার একটা ছোট ভাই হয়েছে। তাকে কোলে করে আদর না করতে পারার দুঃখে রুম থেকে বেরই হতাম না। একদিন সকালে রান্নাঘরে কফি বানাচ্ছিলাম, হঠাৎ দরজা খুলে ভাইয়া ঘরে ঢুকে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, তুমি নির্ঘাত নিদ্রা। তো কেমন লাগছে আমেরিকা?

আমিও নির্দ্বিধায় বলেছিলাম, ভালো না। বাসার মধ্যে থেকে আমেরিকার কি দেখবো?

ভাইয়া এ কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ এ কথা – সে কথা বলে হঠাৎ বললেন, লিবার্টি আইল্যান্ডে যাবে?

আমি তো অবাক! তবুও কিছুক্ষণের মধ্যে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কি যে ভালো লাগলো সারা দিন। কতো কথা বললাম ভাইয়ার সঙ্গে। ভাইয়ার একটা গুণ আছে। খুব সহজেই মানুষের সঙ্গে মিশতে পারেন। জানলাম, তিনি ব্রুকলিন ইউনিভার্সিটি অফ আর্টস অ্যান্ড সাইন্স–এ ল'এ থার্ড ইয়ারে পড়ছেন। সন্ধ্যায় যখন ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরলাম তখন সত্যি সত্যি প্রথমবারের মতো চাচিকে বলেছিলাম, ভালো লেগেছে।

এরপর থেকে চাচা, চাচি, ভাইয়ার সঙ্গে সেন্ট্রাল পার্ক, মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি, মেট্রো মিউজিয়াম অফ আর্ট ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি।

একবার মনে পড়ে, আমার আর্টিফিশিয়াল জিনিস ভালো লাগতো না বলে ভাইয়া এবং চাচি আমাকে মন্টানার একটা র‍্যাঞ্চে নিয়ে গেলেন। বোধ করি, আমার জীবনের সবচেয়ে মজার দিন ছিল সে

দিনগুলো। জানি না কখন আমেরিকানদের প্রিয় পল (প্রবাল থেকে পল) আমারও প্রিয় হয়ে উঠলো। অপারেশনের সময় ভাইয়া সব সময় আমার পাশে পাশে থাকতেন। চাচা–চাচিও আমার দায়িত্ব ভাইয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতেন।

অপারেশনের পর একদিন তার রুমে খোড়াতে খোড়াতে উপস্থিত হলাম। ভাইয়ার তখন সামনে সেমিস্টার ফাইনাল। সারা দিন পড়েন। তবুও সেদিন ভাইয়ার পাশে বসে বকবক শুরু করলাম। কিন্তু ভাইয়া কোনো কথাই বললেন না। মুখ গুজে পড়তে লাগলেন। রাগ করে আমি যখন উঠে চলে আসছি তখন হঠাৎ ভাইয়া আমার ওড়না টান দিয়ে বললেন, রাগ করিস না। একটু বস, এখনই হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি আর থাকিনি। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব রুমে ফিরে দরজা আটকে দিলাম। সেদিনই প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম, ভাইয়াকে আমি ভালোবাসি। প্রচণ্ড ভালোবাসি।

আমার প্রবাস জীবনের বয়স যখন আড়াই মাস তখন হঠাৎ একদিন বাবা এসে হাজির। আমি তখন ভালোই হাটি। বাবাকে চাচা বললেন, তারা আমাকে তাদের কাছে রেখে পড়াতে চান।

আমি ঠিক করলাম, শুধু ভাইয়ার জন্য আমি থেকে যাবো এখানে। ঠিক এ রকম একটা পরিস্থিতিতে একদিন বিকেলে চাচা, চাচি, বাবা, আমি ড্রয়িংরুমে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। এর মধ্যে বাবা অনেকটা ঠাট্টার স্বরে চাচাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তো ছেলের বৌ আনছো কবে?

চাচা উত্তর না দিয়ে উত্তরটা দিলেন চাচি, আমরা তো এখনই আনতে চাই। কিন্তু প্রবাল বলে, পড়াশোনা শেষ করে, স্টাবলিসড হয়ে তারপর বৌ আনবে।

আমার মাথায় যেন বাজ পড়লো। কয়েকদিন ধরেই ভাইয়াকে বলবো বলবো করে বলা হচ্ছে না। তাই অনেক কষ্টে বললাম, ভাইয়ার আবার বিয়ে হলো কবে?

এবার উত্তরটা দিলেন চাচা, মা জানিসই তো, আমাদের সিলেটিদের মধ্যে যারা প্রবাসী তাদের বিয়ে অনেক আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। প্রবালেরও আছে।

আমি আর কিছু শুনতে পেলাম না। শুধু ভাইয়া আসার পর জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তাকে ভালোবাসো?

ভাইয়া মৃদু হেসে বলেছিলেন, যাকে ছোটবেলা থেকে বৌ হিসেবে জানি তাকে না ভালোবেসে পারা যায়।

আমি আমেরিকায় আর থাকিনি। দেশে ফিরে তার সমস্ত স্মৃতি পুড়িয়ে ফেলি। তবুও কি আমি তাকে ভুলতে পেরেছি?

সফলতা নামের সোনার হরিণটির পেছনে ছুটতে গিয়ে আমি আজ আবার প্রবাসী। এমবিএ করছি, সেই আমেরিকাতেই কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে। ভেবেছিলাম আর যাই হোক, ভাইয়ার কাছে কখনো যাবো না। কিন্তু প্রথম সেমিস্টারের কিছুদিন পরে ভাইয়া আমাকে খুজে বের করে নিয়ে গেলেন তার বাসায়। গিয়ে দেখি, ভাইয়া তার কথা রেখেছেন। এস্টাবলিশড হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই বৌ করে নিয়ে এসেছেন ভাবীকে। বাবা মায়ের প্রত্যেকটি প্রস্তাব আমি দূরে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছি। কেন জানি, ভাইয়ার স্থানে অন্য কাউকে কল্পনাই করতে পারি না। এখন এই প্রবাসে ভাইয়া–ভাবীর সবচেয়ে

আপন মানুষ হলাম আমি। তাদের বাসায় মশা মারতে হলেও আমাকে খবর দেয়া হয়। কিভাবে বলি, ভাইয়ার পাশে ভাবীকে দেখলেই আমার মাথায় আগুন ধরে যায়।

কিছুদিন আগে ভাবীর প্রথম বাচ্চা হওয়ার সময় আমি ভীত–সন্ত্রস্ত ভাইয়ার পাশে বসেছিলাম সারা রাত। একটু উঠতে যাবো, এ সময় ভাইয়া খপ করে আমার হাত ধরে বললেন, নিদ্রা, আমাকে ছেড়ে যাসনে।

ভাইয়ার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু মনে মনে বলেছি, ভাইয়া, আপনার জন্য আমি সারা সময়ই ছিলাম, আছি, থাকবো।

আমি জানি, যখন এ লেখা ছাপা হবে তখন আমি হয়তো বা আবার আমেরিকায়। আবার শুনবো বাবা–মা, ভাইয়ের পুরনো সেই অভিযোগ তুমি খুব বদলে গেছো। দেশের প্রতিটি ক্ষণ আমিও মিস করি অন্য প্রবাসীদের মতো। কিন্তু ফিরে আসতে পারি না। তিন মাসের প্রবাস জীবন আমার কাছ থেকে বড় বেশি মূল্য নিয়েছে।

প্রবাল ভাইয়া, তোমার জন্যই আমি ছিলাম, তোমার জন্যই থাকবো। কিন্তু তুমি আমার জন্য নেই। তোমার কি কোনো ধারণা আছে এ কেমন কষ্ট? প্রবাল পাওয়া যায় সমুদ্রে। আমি কোন সমুদ্রে পাবো প্রবালকে? সমুদ্র যে অথৈ, অসীম।

খিলগাঁও, ঢাকা থেকে

পনেরো ঘণ্টার ফরেনার

– মাছুম আলম

আমার দূর সম্পর্কের এক চাচা আজ দুই বছর হলো মালয়শিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন। তিনি আর মালয়শিয়া যাবেন না বলে ঠিক করেছেন। দেশে বাউণ্ডেলের মতো বেকার ঘোরাফেরা ছাড়া কোনো কাজ নেই। তবে তিনি আবার প্রচণ্ড আত্মসম্মানী মানুষ। দেশে ফেরার পর কেউ যদি প্রশ্ন করতো, আপনি কি করেন?

উত্তরে তিনি বলতেন, আমি ফরেনার মানুষ।

এখন দুই বছর পরও তিনি এ প্রশ্নের একই উত্তর দেন। আমরা এ নিয়ে অনেক হাসাহাসি করেছি।

ঠাট্টা, উপহাসের প্রতিবাদ জানিয়ে একদিন তিনি সিরিয়াসলি বললেন, দেখো, আমার খুব বেশি শিক্ষা নেই আবার প্রচুর টাকাও নেই। আর এই দুটি জিনিস না থাকলে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়াও অলীক স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। এবং আমি প্রবাসী হিসেবে বর্তমানে যে অবস্থানে আছি যদি নিম্ন শ্রেণীর কোনো কাজ করতে যাই তাহলে আত্মসম্মানে বাধবে। আবার নিজে বেকার আছি এ কথা যদি নিজ মুখে বলি তাহলে সবাই কেমন আড়চোখে তাকাবে। আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি বেকার বলে নিজেকে লজ্জায় ফেলতে চায় না।

চাচার ক্ষোভ আর অপমান মিশ্রিত কথা শুনে কেমন যেন অস্বস্তি লেগেছিল।

নিজে কখনো বিদেশ যাবো তা ভাবিনি। গত ২০০২ সালের প্রথম দিকে আমেরিকা প্রবাসী ছোট মামা দেশে এলেন। এই মামার সঙ্গে আমার খুব একটা কথাবার্তা হয় না। তিনি দেশে এলে আমি খুব

একটা তার কাছে যাই না। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম মামা আমাকে তলব করেছেন। মামার কাছে গিয়ে কাচুমাচু হয়ে বসলাম।

তিনি বললেন, কাল তুমি একজন মানুষের সঙ্গে দেখা করবে। সে লোক তোমাকে দেখার পর পছন্দ হলে কি কি করতে হবে তা বলে দেবে। সে মতো কাজ করবে। বাদবাকি সব কিছু তোমার বড় ভাইকে বলেছি, তোমার কোনো চিন্তা করতে হবে না। টাকা পয়সার ব্যবস্থা আমি করবো।

পরদিন নির্দিষ্ট লোকটির কাছে গিয়ে হাজির হলাম, সঙ্গে বড় ভাইও। প্রৌঢ়, অথচ খুবই হ্যান্ডসাম লোকটি ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিলেন আমিই পূর্ব আলোচিত লোক কি না। ভাইয়ের সম্মতি পেয়ে আমার উদ্দেশ্যে তিনি একটি প্রশ্ন ছুড়লেন। হোয়াট ইজ ইওর নেম?

আমি তখনো খুব বেশি কিছু জানি না। আমি উত্তর দেয়ার পর পরই তিনি বাড়ি কোথায়, থাকো কোথায়, কি করো ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন। বেশ কিছুক্ষণ ইংরেজিতে কথপোকথন চলার পর থ্যাংকস দিয়ে আমাকে তার পছন্দ হয়েছে বলে জানালেন।

এখানেই জানতে পারলাম আমার লন্ডন যাবার সব ব্যবস্থা তিনিই করবেন এবং সেটা মাস তিনেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

আমার হাতে ইংল্যান্ড সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর সংবলিত ইংরেজিতে লেখা বেশ কয়েক পৃষ্ঠা কাগজ তুলে দিয়ে তা মুখস্থ করতে বলা হলো। আমি মুখস্থ করলাম।

ছয় সাত দিন পর পর এ প্রশ্নগুলোই ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করে কতোটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা জেনে নিতেন। আমার চার কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি চেয়ে নিলেন এবং যে কোনো সময় বিমানে চড়ার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন।

তিন চার সপ্তাহ পরই আমাকে ঢাকায় যাবার জন্য বলা হলো। ঢাকায় গিয়ে নির্দিষ্ট হোটেলে ওঠার পর সেখানে নিয়মিত অন্য একজনের কাছে কোচিং করতে হলো। তিনি বলেছিলেন, কিভাবে ঢাকা এয়ারপোর্ট পাড়ি দেবো, দুবাই নেমে কি করতে হবে, হিথরো এয়ারপোর্টে কিভাবে নামতে হবে, কিভাবে পাসপোর্ট শো করতে হবে ইত্যাদি।

সপ্তাহ খানেক হোটেলে থাকার পর একদিন দুপুরবেলা আমাকে চুল-টুল কেটে রিলাক্সড মুডে থাকার এবং কাপড়-চোপড়সহ প্রয়োজনীয় জিনিস লাগেজে ঢোকানোর জন্য বলা হলো। বুঝতে পারলাম আজই ফ্লাই করছি। কিন্তু গোপনীয়তার স্বার্থে আমাকে কিছুই জানানো হলো না।

সন্ধ্যায় আমার হাতে লাল রঙের বৃটিশ পাসপোর্ট দিয়ে ভালোভাবে পাসপোর্টের তথ্যগুলো মুখস্থ করতে বলা হলো। পাসপোর্ট হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, আমার ছবি কিন্তু নাম অন্যজনের। বুঝলাম অন্যের পাসপোর্টে আমার ছবি ঢোকানো হয়েছে, আদম ব্যবসায়ীরা যাকে পিসি বলে।

আগেই জানলাম জিয়া আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের সঙ্গে আমার দালালের কন্ট্রাক্ট হয়ে গেছে, সেখানে কোনো সমস্যা হবে না। রাত বারোটায় হোটেল থেকে এয়ারপোর্টে গেলাম। ডমেস্টিক এরিয়ায় গাড়ি থামিয়ে বসে থাকলাম দীর্ঘক্ষণ, রাত আড়াইটার দিকে জিয়ার বড় এক কর্মকর্তা এলেন। তিনি কিছুক্ষণ ইংরেজিতে আমার সঙ্গে কথা বললেন। ওকে বলে তিনি নির্দিষ্ট সময়ে লাউঞ্জে চলে যেতে বললেন।

সঠিক সময়ে যাত্রী লাউঞ্জে ঢুকে বোর্ডিং কার্ড পেলাম, তারপর নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি আমাকে বিনা বাধায় ভেতরে নিয়ে গেলেন। সময় মতো বিমান ছাড়লো।

পাচ থেকে সাড়ে পাচ ঘণ্টার মধ্যে দুবাই পৌছালাম।

জানলাম এখানেই আমাকে অগ্নি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। ভালোয় ভালোয় বিমান থেকে নেমে এসে কেনাকাটা করলাম, দুবাই এয়ারপোর্টের ডিউটি ফৃ শপ দেখে মুগ্ধ হলাম। জীবনে প্রথম প্রবাসের মাটিতে পা রাখার আনন্দই ছিল অন্য রকম।

নির্দিষ্ট সময়ে তেরো নাম্বার কাউন্টারে গিয়ে লাইনে দাড়ালাম। এখানে পাসপোর্ট দেখে দেখে যাত্রীদের পাস দেয়া হচ্ছে। আমার পাসপোর্টটি হাতে নিয়েই লোকটি ভালো করে চোখ বোলালো। তারপর চোখ কুচকে প্রশ্ন করলো, হোয়ার ডু ইউ লিভ?

আমি মুখস্থ করে যাওয়া লন্ডনের ঠিকানা বললাম। টুকটাক দুই চারটি প্রশ্ন করে সহযোগী একজন ইনডিয়ান কর্মকর্তাকে ডেকে আমার পাসপোর্ট পরখ করতে বললো। শুরু হলো পাসপোর্ট পরীক্ষা এবং নানান প্রশ্নের ঝড়। সবগুলো প্রশ্নই ছিল সাজেশনের ভেতর থেকে করা। তাই উত্তর দিতে কোনো অসুবিধা হয়নি। প্রশ্নগুলোর মধ্যে ছিল আমি কোন রেস্টুরেন্টে কাজ করি। মালিকের নাম কি, বাসে যাতায়াত করি কি না, বাসের কালার কেমন, হিথরোতে বিমান থেকে নেমে ইমিগ্রেশনে যেতে কতোক্ষণ লাগে ইত্যাদি।

ছোট লেজার লাইট দিয়ে, হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে পাসপোর্ট দেখা হলো। শেষে কাগজ হাতে দিয়ে পাসপোর্টের সাইন কাগজে দিতে বলা হলো, মোটামুটিভাবে শিখে যাওয়া সাইন নকল করলাম। সব পরীক্ষা শেষে আমাকে জানানো হলো, পাসপোর্ট ফলস থাকায় আমাকে যেতে দেয়া হবে না।

বিমানে ওঠার আগে ঢাকার দালাল বলেছিল, পাসপোর্ট নাকি জেনুইন, দুবাইয়ে নকল বললে আমি যেন চ্যালেঞ্জ করি। সে মতে চ্যালেঞ্জ করলাম। লাভ হলো না। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটি রুমে। সেখানে ঢুকেই দেখি জনা বিশেক লোক বসে আছে। বেশ কিছু বাঙালিও রয়েছে। চার পাচ সেকেন্ডের মধ্যেই অফিসার গোছের একলোক রুমে ঢুকে সবাইকে দাড়িয়ে থাকতে বললেন। কিছুক্ষণ পর পর এসে দেখা হতো কেউ বসেছে কি না। জানলাম এটা অবৈধ পন্থা অবলম্বনের শাস্তি। এর মধ্যে নাইজেরিয়ান এক যুবক বসে পড়লে তাকে টেবিলের ওপর দাড় করিয়ে রাখা হয়।

নাম এন্টৃ করার জন্য একজন দারোয়ান বা পিয়নগোছের লোক এসে আমার নাম খাতায় তুললো। আমার ফ্লাইট থেকেই আটকানো আরেক ভদ্রলোকের নাম জানতে চাইলে তিনি ইংরেজি না জানায় কিছু বলতে পারেননি। এতে রেগে গিয়ে ওই লোক হাতের খাতা দিয়ে ভদ্রলোকের গালে দুই চারটা ঘা বসিয়ে দিলেন। সঙ্গে অভদ্রভাবে *শালা বাঙাল* বলে এর সঙ্গে হিন্দিতে লোকটি গালাগালি করলেন।

শালা বাঙাল বলে গালি দেয়ার পর গায়ের রক্ত গরম হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল ওর টুটি চেপে ধরি। কিন্তু বিদেশের মাটিতে অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারিনি। আটকে পড়া অনেক বাংলাদেশি বারো তেরো দিন হয় এখানে আছে বলে জানায়। তাদের এয়ারলাইন্স ঠিকমতো খাবার-দাবারও সরবরাহ করে না বলে জানলাম। দুবাই প্রবেশ করতে গিয়ে যারা ধরা পড়েছে তারা অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছে, হাত বেধে, পানিতে চুবিয়ে, লাঠিপেটা করে নির্যাতন করা হয়েছে।

দীর্ঘ পনেরো ঘণ্টা বদ্ধ ঘরে থাকার পর ডাক এলো ফিরতি ফ্লাইটে চড়ার। আনন্দে ব্যাগ হাতে নিয়েই দরজার দিকে ছুটলাম। আটক অন্যদের দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

একজন হাত ধরে বললো, ভাই, আপনি লাকি, আমরা তেরো দিন হয় পড়ে আছি, কোনদিন ফিরবো জানি না, দোয়া করবেন যেন তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি।

লোকটির করুণ আর্তিতে মন খারাপ হয়ে গেল। এক একটি ঘণ্টাকে যেখানে এক একটি বছর মনে হচ্ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসার আনন্দ সত্যিই যাত্রা শুরুর আনন্দের চেয়ে হাজারগুণ বেশি। আটকে পড়া লোকগুলো ছাড়া পেলে নিশ্চয় আমার চেয়েও বেশি আনন্দ পেতো।

দেশে ফেরার পর এখন আমি সম্পূর্ণ বেকার। কেউ যখন প্রশ্ন করে, আপনি কি করেন?

তখন উত্তরে ওই চাচার মতো বলি, *আমি ফরেনার মানুষ।*

লোকজন চমকে উঠে বলে, কখন, কোথায়, কতোদিন আপনি বিদেশ ছিলেন।

তখন বলি, কেন দুবাইয়ে পনেরো ঘণ্টা ছিলাম।

masumalam@hotmail.com

বলদী, সিলেট থেকে

সমস্যা

– ডাক্তার সারওয়ার

মানুষ বিদেশে পাড়ি জমায় ভাগ্যের অন্বেষণে। কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতার জন্য মানুষ বিদেশে আসে। আমার প্রবাস জীবন ছয় বছরের মতো। সপরিবারে বসবাস করছি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে কর্মরত।

সবাইকে নিয়েই কিছু সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হন অদক্ষ এবং দক্ষ এ দুই শ্রেণীর প্রবাসীরা। আমার পর্যবেক্ষণে এই জিনিসগুলো পেয়েছি। এভাবে :

এক. শারীরিক : আমাদের দেশের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যের তাপমাত্রা চরম এবং আর্দ্রতা খুবই কম। আবার মালয়শিয়া বা সিঙ্গাপুরের আর্দ্রতা বেশি। এই পরিবর্তিত আবহাওয়ার জন্য শারীরিক অভিযোজন প্রয়োজন হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের এই এলাকায় কিছু কিছু অসুখ বেশি যেমন, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনির পাথর ইত্যাদি। এই রোগগুলো কেন এই এলাকায় বেশি তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। জীবনযাত্রায় প্রণালী এবং খাদ্যাভাস এই রোগগুলোর জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে একজন প্রবাসী এই সমস্ত স্বাস্থ্যগত ঝুকির মধ্যে থাকেন।

দুই. অভ্যাসগত : এখানে দেখা যায় যে, সবাই কোমল পানীয় যেমন পেপসি, কোকাকোলা এবং ধূমপানে মার্লবরো, গোল্ডলিফ ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া খাদ্যের ব্যাপারেও জনপ্রতি আধা মুরগি খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষত যারা ব্যাচেলর মেসগুলোতে থাকেন তারা প্রায়ই সাপ্তাহিক বন্ধের দিনে বন্ধু–বান্ধব নিয়ে খাওয়া–দাওয়ার আয়োজন করেন। এই সমস্ত পার্টি তাস পেটানো, ধূমপান, আড্ডা দেয়া ইত্যাদিতে সাজানো। ফলে পরবর্তীকালে দেশে গেলে বাংলাদেশের খাদ্যাভাস অর্থাৎ এক মুরগি দিয়ে পুরো পরিবার এবং পরিবেশ তাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়।

সউদি আরবে জোহরের নামাজের পর থেকে আসরের নামাজের সময় পর্যন্ত জরুরি সার্ভিস বাদে সমস্ত দোকানপাট, অফিস–আদালত, বন্ধ থাকে। ফলে সবাই কিছুটা দিনে ঘুমের অভ্যস্ত হয়ে যায়। এই আলস্য পরবর্তীকালে তার জন্য সমস্যা হয়।

তিন. মানসিক : এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। এখানে দুই রকম শ্রেণী আছে।

ক. যারা পরিবার–পরিজন দেশে রেখে আসেন তাদের আয়ের একটা বড় অংশ চলে যায় দেশে টেলিফোনের পেছনে। অন্ততপক্ষে মাসে একবার দেশে প্রবাসীরা ফোন করেন এবং কমপক্ষে পনেরো বিশ মিনিট তো কথা বলেনই। মিনিটে পাচ রিয়াল করে বিশ মিনিটে একশ রিয়াল খরচ পড়লো। এ জন্যই প্রতি বৃহস্পতিবার, শুক্রবারে এখানে টেলিফোন বুথগুলোতে লাইন পড়ে যায়। তারপরও তারা চিন্তায় থাকেন যে, দেশে তাদের পরিবার–পরিজনরা কেমন আছেন। বিশেষত যাদের সন্তানেরা স্কুল, কলেজে পড়ে তাদের সমস্যা আরো বহুমুখী।

আরেকটি শ্রেণী আছে। তারা দেশে বিয়ে করেই এখানে চলে এসেছেন। তারা ভিসার স্টেটাসের কারণে অথবা আর্থিক কারণে এখানে স্ত্রীকে আনতে পারেননি এবং দেশেও যেতে পারেননি। দীর্ঘ দিন থাকার ফলে তাদের ক্ষেত্রে দেশে সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়।

খ. যারা পরিবার–পরিজন নিয়ে আছেন তারা অনেকেই এ ধারণা পোষণ করেন যে, যারা সপরিবারে বিদেশে তাদের বোধহয় কোনো সমস্যা নেই। হয়তো ইওরোপ, আমেরিকায় যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা ঠিক। কিন্তু তারাও অন্য ধরনের কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের মূল সমস্যা হলো বাচ্চাদের স্কুল, কলেজ। এখানে বেশির ভাগ শহরেই ইংরেজি মাধ্যমের কোনো স্কুল নেই। হাতেগোনা দুই তিনটি শহরে ইনডিয়ান দূতাবাস পরিচালিত স্কুল আছে যেখানে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো হয়।

এরা স্বাভাবিকভাবেই ইনডিয়ান কারিকুলাম অনুযায়ী পড়ায়। ক্লাসে আমাদের বাচ্চারা শেখে রাজ্যসভা এবং লোকসভার সরকার পদ্ধতি, শেখে ইনডিয়ান ইউনিয়নের কথা, শেখে বম্বে, চেন্নাই, দিল্লি, কলকাতার কথা। ক্লাস শুরু করে *জনগণমন* গান গেয়ে। জেদ্দা, রিয়াদ ছাড়া কোথাও মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত পড়ানো হয় না ক্লাস এইটের পর। ফলে দেশে এসে তাদেরকে দুই এক বছর লস দিয়ে নিচের ক্লাসে ভর্তি হতে হয় এবং ভালো কোনো স্কুলেও তারা ভর্তি হতে পারে না। শুরু হয় আরেক সমস্যার।

চার. বাচ্চাদের সমস্যা : এখানে বাচ্চাদের কাছাকাছি বয়সের বন্ধু–বান্ধব বলতে গেলে থাকেই না। এখানে শিশু একাডেমি, আর্ট স্কুল ইত্যাদি মননশীলতা বিকাশের কোনো পথ নেই। ফলে তাদেরও মানসিক বিকাশ ঘটে দেরিতে। এখানে গল্পের বইপত্রও পাওয়া যায় না। ফলে বই পড়ার যে অভ্যাস বাচ্চাদের তৈরি হওয়ার কথা সেটা হয় না। তারা ভিডিও গেম, কমপিউটার গেম ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে যেটা আল্টিমেটলি তাদের পড়াশোনার অসুবিধার সৃষ্টি করে।

এমন নানান রকম সমস্যা নিয়েই আমাদের প্রবাস জীবন।

mustafasarwar9@hotmail.com
তাবুক, সউদি আরব থেকে

বাবা

– জেসমিন আক্তার রেনেসাঁ

তোমার কথা মনে পড়ে। যখন মা ও ছোট বোনটাকে নিয়ে খেতে বসি তখন তোমার কথা বার বার মনে পড়ে। তখন মনে হয়, ইশ! এখন যদি বাবা থাকতেন তাহলে কতো মজাই না হতো।
আরো মনে পড়ে, যখন একা বসে থাকি তখন মনে হয় এখন যদি বাবা থাকতেন তাহলে আমার মনের কথাগুলো বাবাকে বলতাম। বাবা তোমার কথা ভাবতেই নদীর স্রোতের মতো জল বয়ে আসে আমার দুই চোখে।
আমাদের সবার মুখে শুধু তোমারই কথা। তুমি ছাড়া আর কোনো কথাই নেই। তুমি কবে আসবে বাবা? তোমাকে একটিবার দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি আমরা সবাই। বাবা, আমি জানি তুমি টাকার জন্য প্রবাসী হয়েছো। বাবা, তুমি আর কতো টাকা আয় করবে বলো? বাবা, আমি জানি, তুমি জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে টাকা উপার্জন করো।
বাবা, এই টাকা মানুষের উপকার করে। আবার ছিন্ন–বিচ্ছিন্নও করে দেয় মানুষের জীবন। টাকা মানুষের সুখ কেড়ে নেয়, টাকা মানুষকে প্রবাসী করে দেয়। তা বুঝতে পারছি তোমাকে প্রবাসী করে। বাবা, আমি আরো জানি যে, তুমি ওখানে বুকে পাথর বেধে আছো। আমরা তোমাকে দেখার জন্য পথ চেয়ে আছি।
অনেক ছেলেমেয়ে আছে যারা প্রবাসী বাবা দেশে আসার সময় অনেক কিছু চেয়ে বায়না ধরে। তোমার কাছে আমি কিছু চাই না। তুমি খুশি হয়ে যদি আমার জন্য পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে যদি একটি লজেন্স এনে দাও তাহলেই আমি খুশি হবো। যদি কিছু না আনো, আমি আরো খুশি হবো। আমি ওই সব কিছু চাই না, শুধু তোমাকে চাই বাবা।
বাবা, তোমার জন্য পথ চেয়ে থাকবো।

ঝিকরগাছা, যশোর থেকে

শীতের পাখি

– যমুনা

জীবন সংগ্রাম ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই মন্ত্রের ওপর ভিত্তি করেই জীবনের প্রতিটি দিন কাটাচ্ছি। লেখাপড়া করেও পারলাম না জীবনকে মনের মতো করে সাজাতে। তিন বোন, ছোট ভাই ও মা–বাবাকে নিয়ে ছিল আমাদের এক অনাবিল সুখের সংসার। বাবা একটি প্রাইভেট কম্পানিতে চাকরি করতেন এবং মা বাড়িতে সেলাই কাজ করে যা উপার্জন হতো তাতে সুখেই চলছিল আমাদের দিনগুলো। কিন্তু সুখের দিনগুলো বেশি দিন টিকলো না। চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই শ্রমিক ছাটাইয়ের আওতায় চাকরি হারালেন বাবা। ফলে সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিবার নিয়ে বাবা পড়লেন বিরাট সমস্যায়। সংসারে দেখা দিল অভাব–অনটন। এ জন্য বিএ পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট সত্ত্বেও এমএ–তে ভর্তি হওয়া হলো না।

ছুটতে শুরু করলাম চাকরির সন্ধানে যাতে সংসারের বড় মেয়ে হয়ে বাবাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি। কিন্তু চাকরি যে সোনার হরিণ, তা কি সহজে পাওয়া যায়? অগত্যা আর কোনো উপায় না পেয়ে বিভিন্ন বাসায় ঘুরে ঘুরে ছাত্র পড়ানোর চাকরি নিলাম। এর মধ্যে দিয়ে জীবন যে চলে গেছে যৌবনের শেষ দিকে তা টের পেলাম আমাকে নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা থেকে। তারা আমার জন্য পাত্র খুজতে লাগলেন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যৌতুক ছাড়া কোনো বিয়ে কি হয়?

যৌতুক দিয়ে মেয়েকে বিয়ে দেবে তা ছিল আমার বাবার জন্য অনেকটা অসাধ্য। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, দেখতে আমি খুব একটা অসুন্দরী ছিলাম না। যৌবনের দ্বারপ্রান্তে অনেক ভ্রমর এসেছিল। সেদিক থেকে আমাদের পরিবার ছিল খুবই রক্ষণশীল। ফলে কারো সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। অবশেষে আমার জন্য বাবা মা একজন পাত্র ঠিক করলেন।

পাত্র দীর্ঘ দশ বছর প্রবাসে থাকার পর দেশে এলো। ঘটক তাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলো এবং দেখা মাত্র আমাকে তার পছন্দ হয়ে গেল যদিও তার মায়ের আপত্তি ছিল। কারণ আমাদের অবস্থা ভালো ছিল না। তার জেদের কারণে মা রাজি হন এবং পরের দিন আমাদের শুভ বিয়ে সম্পন্ন হয়। মনে অনেক আনন্দ নিয়ে চলে এলাম শ্বশুরবাড়ি।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমার জীবনে এলো সেই কাঙ্ক্ষিত বাসর রাত। দুটি দেহের মিলনের মাধ্যমে কখন যে ভোর হয়ে গেল বুঝতে পারিনি।

বিয়ের দশ দিন পর আমার স্বামী আবার প্রবাস জীবনে ফিরে গেল। তার চলে যাওয়ার পর পরই আমার ওপর শুরু হয় তাদের পরিবারের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। মুখ বুজে সব কিছু সহ্য করে যাচ্ছিলাম। এভাবে কিছুদিন চলার পর অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং বাবার বাড়ি চলে আসি। আমার চলে আসার পর শাশুড়ি তার ছেলের কাছে ফোনের মাধ্যমে আমার চরিত্র নিয়ে বিষোদগার করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তারা সফলকাম হয়। ফলে আমার সঙ্গে আমার স্বামী সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

ছয় মাস পর আমার স্বামী আবার স্বদেশে আসে। দেখা করতে চাইলেও সে আমার সঙ্গে দেখা করেনি। কিছুদিন পর সে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে এবং আমার বাবা মাকে সাবধান করে দিল যে, তারা যদি এ ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাহলে আমাদের পরিবারের ক্ষতি হবে। আমার বাবা মা আমার ছোট ভাইবোনদের মুখের দিকে চেয়ে সব কিছু নীরবে সহ্য করলেন।

বর্তমানে আমি খুবই একা। প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে আর কোনো পুরুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেবো না এবং অন্য মেয়েদের প্রতি আমার একটাই অনুরোধ, তারা যেন শীতের পাখির মতো আসা ওই সব প্রবাসীর খপ্পর থেকে সাবধান থাকে।

ঢাকা থেকে

বুকের ধন

– খালিদ হায়দার দর্পণ

আমার সহায় সম্বল বলতে তেমন কিছু ছিল না। বাড়ির কিছু আবাদি জমি এবং একটা দোকান। এতে কোনোমতে চলতো আমাদের সংসার। দুই মেয়ে আর এক ছেলে মিলে মোট পাচ সদস্যের সংসার।

যেটা বলতে চাচ্ছি তা হলো, আমার বুকের ধন ছেলে ছিল জন্ম থেকেই অসুস্থ। কথা বলতে পারতো না, হাটতে পারতো না। শরীর একদম দুর্বল। আমার ছেলে দেখে বুকটা দুর দুর করে, মনে হয় চিৎকার করে কাদার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলি। তবুও দুই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জল।

অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। তারা বলে, আপনার ছেলে বিদেশে চিকিৎসা করাতে হবে। তাহলে ভালো হয়ে যাবে।

আমার যেটুকু সম্পদ আছে তা দিয়ে বিদেশ যাওয়া–আসার প্লেন ভাড়াটাও হয় না। কি করবো! ভাবতে ভাবতে হারিয়ে ফেলি ভাবনা শক্তি।

আমার এক দূরসম্পর্কের ভাই ছিল দুবাই। সে কিছুদিনের ছুটিতে বাড়িতে এসেছে। তার কাছে গেলাম। তাকে অনেক বুঝিয়ে বললাম, মুরাদ, তুই আমার ছেলেটাকে বাচা। সে না বাচলে আমিও বাচবো না। ওর কষ্ট আমার আর সহ্য হয় না।

মুরাদের হাত ধরে কাদতে থাকলাম। সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, আমার তো আর খুব একটা টাকা–পয়সা নেই। তবে তোকে আমি একটা ভিসার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তুই শুধু যাওয়ার ভাড়া এবং পাসপোর্ট করে নিবি। আর ভিসার টাকাটা আমাকে কাজ করে শোধ করে দিবি।

আমিও মহানন্দে বাড়িতে এলাম এবং এক মাসের মধ্যে জমি বিক্রি করে পাসপোর্ট এবং প্লেন ভাড়াটা রেডি করলাম। দেড় মাস পর একটা ভিসা এলো আমার নামে। আমি আর স্থির থাকতে পারছিলাম না।

আমার নয়নের মণিকে বিদেশ নিয়ে দেখাবো, সে ভালো হয়ে যাবে। আমাকে আব্বা বলে ডাকবে। আমি আর কিছুই চাই না খোদা, কিছুই না।

ফ্লাইটের তারিখ হয়ে গেল এবং দুবাই পৌছে গেলাম। এক চোখে মহাআনন্দ, অন্য চোখে নতুন জায়গার ভয়। শুনেছি ভিসা সমস্যা হলে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, মারে এবং জেলও হয়।

কাজ পেলাম পাথর টানার। প্রখর রোদ, সেখানে এতো বেশি তাপমাত্রা যে নিজেকে মেলাতেই পারছি না। বড় বড় পাথর মাথায় করে লরিতে তুলে দিতে হয়। কয়েকদিন পর অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

এখানে একটা কথা বলা দরকার, টাকা রোজগার করার জন্য বিদেশে এসেছি। এই টাকা দিয়েই আমার ছেলেকে চিকিৎসা করানোর জন্য বিদেশ নিয়ে যাবো। বহু কষ্টে ত্যাগ শিকার করে সাত লাখ টাকা তিন বছরে জমা করলাম। এখন দেশে ফেরার পালা।

দুবাইতে অনেক নামকরা ডাক্তার আছে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তারা এখানে নিয়ে আসতে বললো। বললো, না দেখে তো কিছু বলা যায় না। তবে আমাদের বিশ্বাস, তোমার ছেলেকে ভালো করতে পারবো।

অনেক দিন থাকার কারণে সেখানে একটা ভালো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকেই আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করার আশ্বাস দিল। আমার মালিককে ধরে আরো এক বছরের কাজ করার অর্ডার বা আকামা করে নিলাম ছেলের চিকিৎসা করাবো বলে।

তিনিও সদয় হলেন এবং তিন মাসের ছুটিসহ এক বছরের কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি করলেন।

চোখে–মুখে আনন্দ, মেয়েদের জন্য এবং বাবার জন্য কিছু কেনাকাটা করে দেশে ফিরলাম এক বুক আশা নিয়ে। আমার বুকের ধন ভালো হবে, আমার সঙ্গে চলাফেরা করবে, আরো কতো কি।

কিন্তু একি! আমি কি শুনছি? আমি অন্ধ হয়েছি নাকি, না তো! সবাইকে খুজে পাচ্ছি শুধু... না আর সহ্য করতে পারলাম জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

আমার আশা আমার ভালোবাসা, আমার জীবন, আমার বুকের ধন নয়নের মণি, বংশ প্রদীপ, না, না এ হতে পারে না। আমার এ টাকা-পয়সা কি হবে। যার জন্য এ কষ্ট করলাম সেই যখন বেচে নেই! আমি বিদেশ যাওয়ার ছয় মাস পর আমার বুকের ধন চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছে। আমাকে কেউ জানায়নি। সবার কাছে আমার ছেলের আত্মার শান্তির জন্য দোয়া চাচ্ছি।

মাছিমপুর, পাবনা থেকে

ফাদ

– সৈকত

সবেমাত্র এইচএসসি পাস করেছি। দারিদ্রের গ্লানি মোছার জন্য অনেক চেষ্টার পর প্রবাসে চাকরি পাই সউদি আরবের আল-নাসিম নামক স্থানে। এ প্রাপ্তি ছিল আমার প্রয়াত দাদার দোয়ায় ও রক্ত সম্পর্কিত কাকার সহযোগিতায়। প্রবাস জীবনে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের লাঞ্ছনা, প্রবঞ্চনা, অবহেলা, অপমান আমার সারা রক্ত কণিকায় মিশে আছে।

রিয়াদ শহরে প্রবাসী জীবনে রক্তের আত্মীয়দের কাছ থেকে যে অবহেলা, লাঞ্ছনা পেয়েছি তার অভিজ্ঞতা থেকে কারো সঙ্গে রক্তের নয়, হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ার একটা প্রবল ইচ্ছা আমার মনে জাগে।

আমার মতো যারা প্রবাসে থাকে তারা বড় বেশি মায়া-মমতার কাঙাল। আমি প্রবাসের অবসরে প্রায় সময় বাংলাদেশের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন পড়তাম। ১৯৯৬ সালের আগস্টের দিকে একটি বাংলাদেশি সাপ্তাহিক পত্রিকায় দেখলাম এক বাংলাদেশি মা চেয়েছে ছেলে এবং তার মেয়ে চেয়েছেন ভাই। পত্রিকায় তাদের ঠিকানা দেয়া ছিল। তাদের ঠিকানায় একটি পত্র দিলাম। তার সুন্দর ও সহানুভূতিপূর্ণ প্রতি উত্তর পেলাম। তাদের ঠিকানা ছিল বাংলাদেশের দক্ষিণবঙ্গে।

আস্তে আস্তে তাদের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লাম। রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের খারাপ আচরণ ভুলে গেলাম। হৃদয়ের আত্মীয় একটি মা, বাবা ও কলেজ পড়ুয়া বোন পেলাম। প্রতি সপ্তাহে মা ও বোনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। কোনো কারণে এক সপ্তাহ যোগাযোগ না থাকলে অস্থির হয়ে পড়তাম। ঠিক তেমনি মা, বোনও। এভাবে আস্তে আস্তে তাদের কাছে আপন হয়ে যাই এবং তারাও আমার কাছে।

সময় চলে যায়, মা ও বোনের অনুরোধে দেশে আসি। আমার গ্রামের বাড়ি ঢাকা জেলায়। দেশে এসে দেরি না করে চলে যাই মায়ের কাছে। বাবা ছিলেন বাংলাদেশ রাইফেলস-এর একজন ভিওপি কমান্ডার। চাকরি জীবনে তিনি কোনোদিন তার বৌ এবং মেয়েকে সঙ্গে নেননি। মাকে অসুস্থ দেখে আমার খুব মায়া হয়। বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে মাকে এবং বোন নিয়ে ঢাকা চলে আসি। মাকে চিকিৎসা করাই। মা হলেন এজমা রোগী। চিকিৎসার ফলে মা মোটামুটি সুস্থ হন। তাকে আর গ্রামে যেতে দিইনি। বোনকে ভর্তি করে দিই লালমাটিয়া মহিলা ইউনিভার্সিটি কলেজে ইসলামি স্টাডিজে।

বাবা ছুটিতে ঢাকা আসেন। তখন তার পোস্টিং ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। এসে আমার ব্যবহারে মুগ্ধ হন। এবং অনেক কান্নাকাটি, অনেক প্রতিজ্ঞা করেন। তার সম্পত্তির অর্ধেক মালিক বানাবেন ইত্যাদি। বিদেশে যেতে হবে না। পারে তো তখনই তার সব কিছু তিনি আমাকে লিখে দেন।
ছয় মাস ছুটি থাকাকালে তার ডিপার্টমেন্টসহ সব জায়গায় আমাকে তার ছেলে হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। আমার আগের নাম মুছে ফেলে তারা নতুন নাম দেন সৈকত।
সেদিন থেকে সৈকত হয়ে গেলাম। আপু পেলাম, মা-বাবা পেলাম। নিজেকে খুব সুখী মনে করলাম। ঢাকাতে আপার জায়গা নেই বলে তাকে ছয় শতাংশ জায়গা লিখে দিলাম।
আপাকে সব সময় *আপু* বলে ডাকতাম। আপা আমাকে তার ছোটভাই হিসেবে সৈকত, নয়ন, চোখের মণি ইত্যাদি বলে ডাকতেন। ছয় মাসে এমন অবস্থা হলো, এক মুহূর্ত আপুকে, মাকে না দেখলে ভালো লাগে না। সুখের সময় শেষ হয়ে গেল। ছুটি শেষ হলো। আপুকে বলতেই আপু জ্ঞান হারালেন। সুস্থ হলে তাকে বুঝিয়ে চোখের পানি মুছে দিয়ে নভেম্বরের ১৮ তারিখ রাত দুটায় আবার প্রবাসে পাড়ি দিলাম।
এরই মাঝে চলে গেল বেশ কয়েক মাস। আপু, মায়ের কান্নাকাটিতে কোনো রকম এক বছর কাটালাম। তারপর আপুর এক ডাকে সাড়া দিয়ে দেশে চলে এলাম। দেশে চাকরি নিলাম একটি প্রাইভেট ফার্মে। চাকরি, আপু এ নিয়ে দিন ভালোই কাটছিল। সময় চলে যায়, আপু মাস্টার্স ডিগ্রি পাস করেন। এর পেছনে যতো শ্রম দিয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।
আপুর বিয়ের কথাবার্তা চলছে। একদিন আপুকে দেখতে লোকজন এলো। বাবা, মা লোকজনের কাছে পরিচয় করে দিলেন আমার একটি মাত্র মেয়ে আর কেউ নেই। এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক তো মেয়েই হবে। এবং আমাকে পরিচয় করে দিলেন এভাবে – সৈকত আমার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়, সাভারে বাড়ি।
সেদিন আপু এবং আমি দুইজন ভীষণ কেঁদেছিলাম। কিছুদিন পর আমাকে না জানিয়ে আপুকে গ্রামে নিয়ে বিয়ে দেন এবং এর কিছুদিন পর আমার দেয়া ছয় শতাংশ জমি বিক্রি করে তারা ঢাকা রায়েরবাজার প্লট কেনেন।
প্রয়োজন শেষ হলো ভাইয়ের, ছেলের। আপু এখন স্বামী পেয়েছেন, আপুর মা-বাবা পেয়েছেন ছেলে। কিন্তু আমি হারিয়েছি আমার রঙিন স্বপ্ন, হারিয়েছি আমার প্রাণপ্রিয় আপুকে।

সাভার, ঢাকা থেকে